দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

‘গুন্ডাদমন আইন, ২০২৬’
রাজ্যে আইনের শাসন
পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনিবার্য অস্ত্র — ১১

গুন্ডামুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে
গুন্ডাদমন আইনের প্রয়োজন
ছিল — পৃঃ ১৩

৭৮ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা।। ২০ জুলাই, ২০২৬।। ৩ শ্রাবণ, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

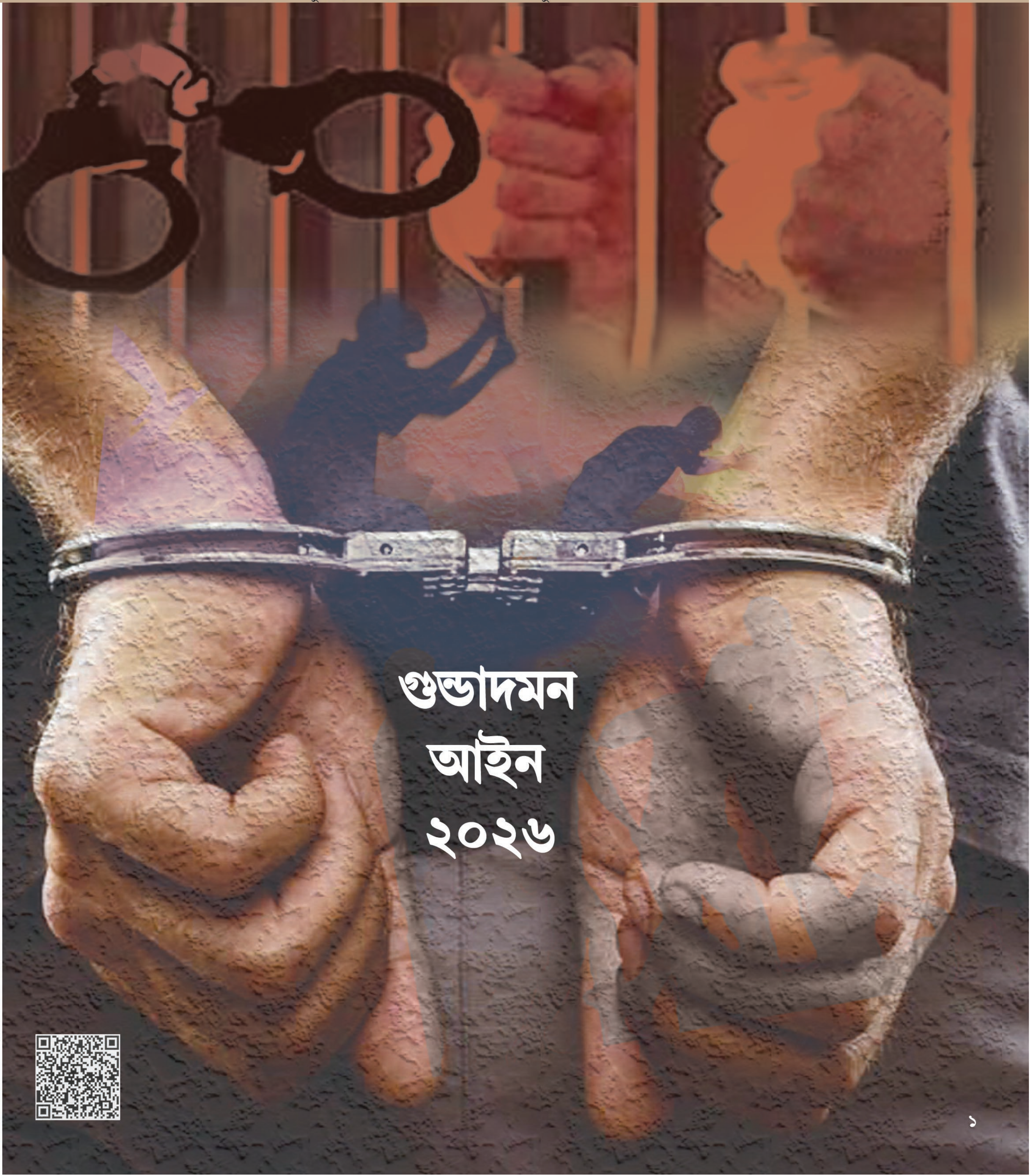

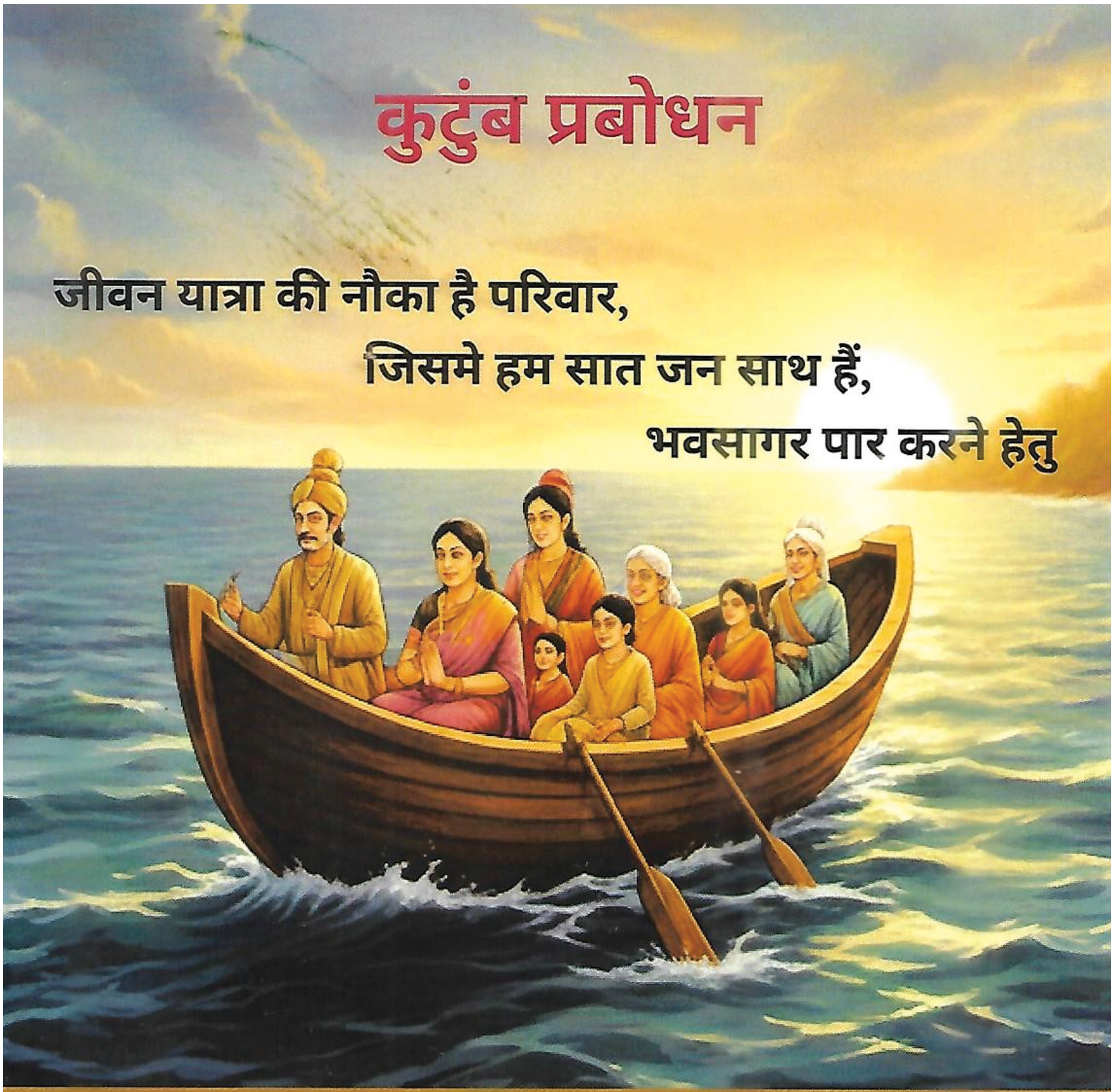

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ৩ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

২০ জুলাই - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

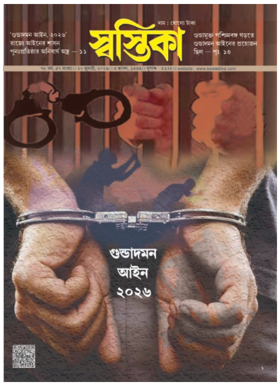

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

সাত দশকের শাসনহীন পশ্চিমবঙ্গে আঙুল বাঁকিয়েই ঘি তুলতে হবে : যোগী দর্শন ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিদি, আমরা কি আর গুন্ডামি করতে পারবো না! ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

শক্তিশালী ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা রাষ্ট্রনায়ক ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ◻ নরেন্দ্র মোদী ◻ ৮

ঝটকা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং একটি অমীমাংসিত দাবি ◻ উতঙ্ক ব্যানার্জী ◻ ১০

পশ্চিমবঙ্গের 'গুন্ডা দমন আইন, ২০২৬' ঃ এরাজ্যে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনিবার্য অস্ত্র ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১১

গুন্ডামুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে গুন্ডা দমন আইনের প্রয়োজন ছিল ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১৩

পশ্চিমবঙ্গে গুন্ডাদমন আইন পাশ করানো মানুষের দাবি ছিল ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৫

পশ্চিমবঙ্গ বাজেটে ২০২৬-২৭ ঃ 'উন্নত পশ্চিমবঙ্গ' নির্মাণের পথে নতুন যাত্রা ◻ ডঃ ধনপতরাম আগরওয়াল ◻ ১৭

অখণ্ড দিনাজপুর জেলার লোকসংস্কৃতির সোনার ফসল 'খন গান' ◻ ডঃ দেবব্রত রায় ◻ ৩১

বিপত্তারিণী ঃ ভাষার অণুজ উপাদান-নির্ভর পর্যবেক্ষণ ◻ শ্যামলচন্দ্র দাস ◻ ৩৩

বাংলাদেশে একাত্তরের মতো আরেকটি হিন্দু গণহত্যার উসকানি ◻ বিশেষ প্রতিনিধি ◻ ৩৫

নতুন পশ্চিমবঙ্গের সন্ধানে কল্যাণের গণ্ডি পেরিয়ে উন্নয়নের পথে রাজ্য বাজেট ◻ অরিত্র ঘোষ দস্তিদার ◻ ৩৭

পশ্চিমবঙ্গের নতুন জননিরাপত্তা আইন ঃ সংবিধান, সমাজ, সুশাসনের হাতিয়ার ও জাতীয় ঐক্যের প্রেক্ষাপটে একটি পর্যালোচনা ◻ প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায় ◻ ৪৩

'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' পশ্চিমবঙ্গে এখনই প্রণয়ন প্রয়োজন ◻ কৌটিল্য ◻ ৪৬

বারুইপুর এনকাউন্টার, ভরসা ইন, ভয় আউট ◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ৪৮

বারুইপুরের সত্য ঃ লাহেক আলির গ্রেপ্তার ও কমরেডদের খসে পড়া মুখোশ ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৯

গল্প কথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০** ◻ **খেলা : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

প্রকাশিত হবে
২৭ জুলাই
২০২৬

স্বস্তিকা

শ্রীগুরুপূর্ণিমা

প্রকাশিত হবে
২৭ জুলাই
২০২৬

অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আলোরপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য পথপ্রদর্শক গুরু বা শিক্ষককে সম্মান জানাতে শ্রীগুরুপূর্ণিমা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে দিনটি মহর্ষি বেদব্যাসের আবির্ভাব তিথি হিসেবেও স্মরণ করা হয়।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় শ্রীগুরুপূর্ণিমার বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে উনআশি বর্ষ পূর্ণ করতে চলেছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজ্যের মানুষের সুরক্ষা কবচ—গুন্ডা দমন আইন

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বহু বৎসর গুন্ডারাজে জর্জরিত। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা-সহ ক্ষমতায় আসিয়াছিল। এই সময় কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের অভাবনীয় দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর হামলা, হত্যা এবং এলাকাছাড়া করিবার ঘটনা ঘটিয়াছিল। সত্তরের দশকের এই পর্বে রাজনৈতিক পালাবদল ও গুন্ডারাজের যে উত্থান ঘটিয়াছিল তাহা পরবর্তী দশকগুলিতে রাজ্যের রাজনীতিতে স্থায়ী প্রভাব ফেলিয়াছিল। কংগ্রেসের গুন্ডারাজ বিশেষত ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার ভয়াবহতার বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষ বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় আনে। ১৯৭৭ সাল হইতে ২০১১ সাল পর্যন্ত তাহারা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এই দীর্ঘ সময়কালে তাহারা কংগ্রেসের হইতেই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সমগ্র রাজ্যটিতে লালসন্ত্রাস কায়েম করিয়াছিল। ইহাদের গুন্ডাগিরি তথা সন্ত্রাসের খতিয়ান খুবই দীর্ঘ। চৌত্রিশ বৎসরের শাসনকালে ইহারা পশ্চিমবঙ্গের মাটি নিরীহ মানুষের রক্তে লাল করিয়াছিল। শান্ত গ্রামীণ জীবনকেও ইহারা অশান্ত করিয়াছিল। ইহাদের দীর্ঘ শাসনকালের স্থায়িত্বের চাবিকাঠি ছিল গুন্ডাবাহিনী। সুশীল সমাজ ইহাদের 'হার্মাদ' নামে অভিহিত করিয়াছিল। বামফ্রন্টের গুন্ডারাজের প্রতিরোধ করিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান হইয়াছিল। কী আশ্চর্য, সিপিএমের গুন্ডারাজের বিরুদ্ধে যাহাদের উত্থান, তাহারাও কিন্তু চরম গুন্ডারাজ কায়েম করিয়াছিল রাজ্যব্যাপী। সিপিএমের হার্মাদবাহিনীকেই ইহারা শক্তিকেন্দ্র করিয়াছিল। তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল জেহাদিশক্তি। ইহাদের সিংহভাগ আবার বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী মুসলমান। ২৭ শতাংশ মুসলমান ভোটব্যাংকের লোভে এই সরকার বিগত ১৫ বৎসর রাজ্যটিকে নরকের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। এই গুন্ডাবাহিনীর লক্ষ্য ছিল রাজ্যের নিরীহ হিন্দুসমাজ। ইহাদের দৌরাত্ম্যেই রাজ্যের সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলি হিন্দুশূন্য হইতে শুরু করিয়াছিল। ইহাদের দ্বারা অসংখ্য হিন্দু নারীর সম্ভ্রমহানি ঘটিয়াছে। ইহারাই রাজ্যের অভ্যন্তরে কত মিনি পাকিস্তান গড়িয়া তুলিয়াছিল। যেকোনো অজুহাতে তাহা সিএএ কিংবা এসআইআর হউক, স্বয়ং দলনেত্রীর উসকানিতে ইহারা কতশত সরকারি ও বেসরকারি সম্পদ ধ্বংস করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই গুন্ডারাজ ও মাফিয়ারাজ হইতে পরিত্রাণ পাইতে রাজ্যবাসী ইহাদের মদতদাতা শাসনের অবসান ঘটাইয়া প্রকৃত দেশভক্ত দলকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে। নূতন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে আইনের শাসন উপহার দানের লক্ষ্যে রাজ্য বিধানসভায় 'দ্য ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিক সেফ্‌টি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টিসোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ্ বিল-২০২৬, পাশ করিয়াছেন। রাজ্যের মানুষ ইহার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানাইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য এবং রাজনৈতিক হিংসা দমন করিয়া রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিতেই এই আইন পাশ করিয়াছে রাজ্য সরকার। সহজ করিয়া এই আইনকে 'গুন্ডাদমন আইন' নামে অভিহিত করা হইতেছে। পূর্বতন সরকারের আমলে সরকারি মদতে যেভাবে গুন্ডা ও জেহাদি বাহিনীর বাড়বাড়ন্ত হইয়াছে তাহার প্রতিকার কল্পে আইনটির প্রয়োজন পড়িয়াছে। এই আইনের বলে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গুরুতর অপরাধ কিংবা হিংসাত্মক বিক্ষোভের ঘটনা ঘটিবার পূর্বেই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা হইবে। শুধু তাহাই নহে, অপরাধগুলিকে জামিন অযোগ্য করা হইয়াছে, যাহার ফলে অভিযুক্তরা সহজেই জামিন পাইবে না। এমনকী অপরাধীদের মদত দান এবং সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট করিবার ঘটনায় জড়িতদেরও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আইনি সংস্থান রাখা হইয়াছে। বিগত বাম ও তৃণমূল সরকার রাজ্যের নাগরিকদের রক্ষক না হইয়া নিজেরাই ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। গুন্ডাদের অত্যাচারের প্রতিকার না করিয়া তাহারা নিজেরাই গুন্ডা হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষ তাহাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়াছে। বর্তমান সরকার মানুষের আশীর্বাদে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারা মানুষকে সুশাসনের অঙ্গীকার প্রদান করিয়াছে। রাজ্যে সরকার গঠন করিয়াই তাহারা সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বলিয়াছেন, আইনটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার নিমিত্ত নহে বরং রাজ্যের মানুষের সুরক্ষা কবচ হিসাবে কাজ করিবে।

সুভাষিতম্

অনির্বেদ প্রিয়োমূলমর্নির্বেদঃ পরং সুখম্।
অনির্বেদো হি সততং সর্বার্থেষু প্রবর্তকঃ।।

অর্থ ঃ উৎসাহ হলো সফলতার মূল। উৎসাহ হলো সর্বোত্তম সুখ। উৎসাহী ব্যক্তি সকল কাজে সবসময় সফল হন।

সাত দশকের শাসনহীন পশ্চিমবঙ্গে আঙুল বাঁকিয়েই ঘি তুলতে হবে

যোগী দর্শন

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সবে তো কলির সন্ধ্যে। অপরাধীদের খারাপ সময় আসছে। ন্যক্করজনক বারুইপুরকাণ্ডের এক অপরাধীকে 'এনকাউন্টার' করেছে পুলিশ। গুলি করে মেরে ফেলেছে। নরপশুটি পুলিশের অস্ত্র ছিনতাই করে পুলিশকেই হত্যা করতে চেয়েছিল। এটা নরম করে দেখা বা ভাবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনে পুলিশকে 'ট্রিগার হ্যাপি' হতে হয়। উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে তাই ঘটেছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১৯০০ মাফিয়া আর অপরাধীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাপের ঘর বড়ো হলে ধর্মকে তার রূপ পালটাতে হয় বলেছে মহাভারত। চা-কফির সেমিনার, আড্ডা আর সান্ধ্য মদ্যপানের আসরে ওই সব অবান্তর আলোচনা চলতে পারে। সরকারি অ্যাকশন আর কার্যক্রম শুরু হলে তা যে চাপের মুখে গলে যেতে পারে সত্তরের দশকে নকশালি খোকামি তার প্রমাণ।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতিতে সামাজিক আর ফৌজদারি এনকাউন্টার বিরল ঘটনা। নকশাল অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে কুখ্যাত এক পুলিশ অফিসারকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় রাজনৈতিক এনকাউন্টার শুরু করেন। যুব আর নব কংগ্রেসের সমাজবিরোধীদেরও কাজে লাগানো হয়। বিদেশি বামেরা তখন তাঁর লেজুড় হয়েছিল। সবাই মিলে সফলতার সঙ্গে নকশালি আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেলে। তাতে নকশালবাড়ি আর কুল উবে যায়। তবে উত্তরপ্রদেশে বা মহারাষ্ট্রে এনকাউন্টার মডেল চালু হওয়ার বহু আগেই এ রাজ্যে তা চালু হয়েছিল। বলা চলে ভারতে প্রথম। ২০১৯-এ তেলেঙ্গানার পুলিশ ৪ ধর্ষক অভিযুক্তকে এনকাউন্টার করে সারা দেশের মহিলাদের আশীর্বাদ কুড়িয়েছিল।

প্রায় ৫০ বছর ধরে (১৯৭৭ থেকে ২০২৬) এ রাজ্যে তা বন্ধ ছিল। যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় থাকার লোভে আগেকার সকল শাসকই সমাজবিরোধীদের বন্ধু করে নেয়। যুব কংগ্রেস নেতা বিজয় সিংহ নাহার একবার বলেছিলেন, '১৯৬৭ সালের শেষ থেকেই কংগ্রেস সমাজবিরোধী নির্ভর দল হয়ে যায়। তাদের নেতারা সমাজবিরোধী আর গুন্ডাদের চায়ের টেবিলে বসতে দিতেন। এমনকী শয়ন কক্ষেও জায়গা দিতেন।'

রাজ্যের আগের সরকারের নেতা-নেত্রীরা সেই কংগ্রেসের উচ্ছিষ্ট ছিল। ১৯৭৭-এর পর থেকে ১১টি রাজ্য নির্বাচনে তারা সমাজবিরোধী, ধর্ষক আর সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কে তেজপাতার মতো ব্যবহার করত বিরোধীদের বিরুদ্ধে। ২০২৬-এর রাজনৈতিক পরিবর্তন নতুন বিজেপি সরকারের হাত ধরে কী বার্তা নিয়ে আসতে পারে তা তাদের ধারণার বাইরে।

> **বিগত সাত দশকে কোনো শাসকই হিন্দু ভোটের উপর নির্ভর করেনি। মুসলমান ভোটকে তারা বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করত। এবারের ভোটে তাদের ভরাডুবি হয়।**

রাজ্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ গুন্ডা দমন আইন লাগু হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত আইনের আওতার বাইরে রাখা মুসলমানদের আইনের শাসনের ভিতরে নিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এক দেশে একটাই আইন। সম্প্রদায়ভিত্তিক আলাদা কোনো আইন হয় না। বহুদিন থেকেই এ রাজ্যে তিন ধরনের আইনের ব্যবস্থা চালু রয়েছে— শাসকের আইন, সমাজবিরোধী আইন আর মুসলমানদের জন্য আইন। বিগত সাত দশকে কোনো শাসকই হিন্দু ভোটের উপর নির্ভর করেনি। মুসলমান ভোটকে তারা বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করত। এবারের ভোটে তাদের ভরাডুবি হয়। বিজেপি ৪৬ শতাংশ ভোট পায় যার মধ্যে রয়েছে মোট ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোটের ৬৫ শতাংশ।

অর্ধশতাব্দী ধরে রাজ্যে হিন্দু বিরোধিতার ধারা চলেছে। ৩৫ শতাংশ হিন্দু এখনও বিজেপি বিরোধী শিবিরে ভোট দিচ্ছেন। এই ভোটের সিংহভাগ ঘরে তুলতে হবে। শুভেন্দুবাবু সঠিক বলেছেন সামনের ভোটে বিজেপিকে ৬০ শতাংশ ভোট পেতে হবে। বিজেপি নেতাদের সে কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, এবার ভোটে বিজেপির জয় যতটা তার থেকে অনেক বেশি মানুষ আর ভোটারের। পুরনো সরকারের কুকীর্তি বিরোধী ভোট। দু'মাস অতিক্রান্ত হয়েছে তাই মূল্যায়ন আর কাজের সময় হয়েছে। যত শীঘ্র সম্ভব বাইরের সঙ্গে ভিতরের এনকাউন্টারও চালু করতে হবে। এই দু'প্রকার এনকাউন্টারেই শেষ হবে রাজ্য আর দেশ বিরোধী শক্তি। কিছু বাইরের বেনোজল আশ্রিত হিসেবে ঢুকে পড়তেই পারে। সরকার বা দলের তাতে ক্ষতি হবে না।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

দিদি, আমরা কি আর গুন্ডামি করতে পারব না!

গুন্ডি দিদি,

পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়েছে গুন্ডাদমন আইন। কিন্তু এবারে কী হবে দিদি! আপনি যে গুন্ডিপনা দেখিয়েছেন সে সব আর হবে না! আপনি না হয় ঘরে বসে ফেসবুক করছেন আর টিভি সিরিয়াল দেখছেন কিন্তু আপনার ভাই হিসেবে আমাদের কী হবে দিদি! আমরা কি আর গুন্ডামি করব না!

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কাদের জন্য এই আইনের প্রয়োজন, তা-ও জানিয়েছেন। বলেছেন, 'কমিউনিস্ট হার্মাদ এবং তৃণমূলি গুন্ডাদের জব্দ' করার জন্যই এই আইনের প্রয়োজন ছিল। রাজ্যে ১৫ বছর গুন্ডাদের সরকার ছিল। তার আগে হার্মাদদের সরকার ছিল। ৩৪ বছরের কমিউনিস্ট হার্মাদ এবং ১৫ বছরের তৃণমূলি গুন্ডা; এদের জব্দ করার জন্যই এই আইনের খুব প্রয়োজন ছিল।

এবার থেকে তার মানে দিদি, বিক্ষোভ-প্রতিবাদের নামে সরকারি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করলে কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে রাজ্য সরকার। আইনশৃঙ্খলার গুরুতর অবনতি থেকে হিংসাত্মক বিক্ষোভের আঁচ পেলেই গ্রেপ্তার করা যাবে অভিযুক্তদের। এছাড়া যে কোনও সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি নষ্টের ক্ষেত্রে এবার থেকে গুন্ডাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে রাজ্য সরকার। কিন্তু দিদি, সেই যে আপনার নেতৃত্বে বিধানসভায় ভাঙচুর হয়েছিল, আরও অনেক আছে সব চেয়ে বিখ্যাতটাই বললাম, সেটার যদি বিচার হয় এখন?

দিদি, কী মারাত্মক আইন করেছে জানেন! গুন্ডাদমন আইন অনুযায়ী, ঘটনা ঘটানোর আগেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারবে পুলিশ। এছাড়া যে কোনও সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি নষ্টের ক্ষেত্রে এবার থেকে গুন্ডাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তও করতে পারবে রাজ্য সরকার। আইন অনুযায়ী বিক্ষোভ, দাঙ্গা, ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগের জেরে সরকারি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে রাজ্য সরকার। এর জন্য অভিযুক্তের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে। 'ক্লেমস্ কমিশন'-এর কাছে আবেদন করে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন ক্ষতিগ্রস্তরা। এক্ষেত্রে 'ক্লেমস্ কমিশন'কে দেওয়ানি আদালত হিসেবে গণ্য করা হবে।

আমার ভয় তো অন্য জায়গায় দিদি। আপনাকে নিয়েই ভয়টা। কারণ, আইন বলছে, অপরাধীর পাশাপাশি উসকানি দিলে বা অর্থ জোগান দিলে এবং সংগঠক ও অভিযুক্তের আশ্রয়দাতাকেও অভিযুক্ত হিসেবে গণ্য করা হবে। এর মানেটা কী! হ্যাঁ। বললেই হলো? নিজের ভাইপোকেও আর বাড়িতে থাকতে দেওয়া যাবে না নাকি!

এই আইন অনুযায়ী সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বলতে বলা হয়েছে, জনগণের মধ্যে আতঙ্ক, বিপদ, ভয় বা নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করা। জনশৃঙ্খলা বা জনশান্তিকে বিঘ্নিত করা। মানুষের অধিকার, বৈধ ব্যবসা, পেশা বা জীবিকার স্বাভাবিক কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি করা। কারুর স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বেআইনিভাবে তাকে উচ্ছেদ করা। কোনও ঘটনার জন্য সরকারি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করা।

এই আইন অনুযায়ী কেউ নিজে অথবা কোনও দলকে কাজে লাগিয়ে, গ্যাং বা সিন্ডিকেটের সদস্য বা নেতা নিয়মিতভাবে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ করেন বা করার চেষ্টা করেন, উসকানি দেন, অর্থ জোগান বা সহায়তা করেন তাকে গুন্ডা বলা হয়। তার মানে সমাজসেবী সেজে তৃণমূলের দাদারা যা যা করতেন সবটাই গুন্ডাগিরি!

এই আইনে 'গুন্ডা' বলতে প্রধানত কাদের বলা হয়েছে জানেন দিদি? এই আইন অনুযায়ী কেউ নিজে অথবা কোনও দলকে কাজে লাগিয়ে, গ্যাং বা সিন্ডিকেটের সদস্য বা নেতা নিয়মিতভাবে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ করেন বা করার চেষ্টা করেন, উসকানি দেন, অর্থ জোগান বা সহায়তা করেন তাকে গুন্ডা বলা হয়। তার মানে সমাজসেবী সেজে তৃণমূলের দাদারা যা যা করতেন সবটাই গুন্ডাগিরি! সেরেছে রে...

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর ধারা ১১১ বা ১১২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে চার্জশিট পাওয়া কোনও ব্যক্তি অস্ত্র আইন ১৯৫৯, মাদক আইন ১৯৮৫, অনৈতিক পাচার (প্রতিরোধ) আইন ১৯৫৬ বা ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেন, করার চেষ্টা করেন, সাহায্য করেন, প্রচার করেন বা অর্থ জোগান দেন এমন ব্যক্তিকে গুন্ডা বলা হয়।

আইন অনুযায়ী, কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করতে হলে পুলিশ সুপার বা তাঁর ওপরের পদমর্যাদার আধিকারিকের রিপোর্ট লাগবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার আটকের নির্দেশ দিতে পারবে। গত ৭ বছরের মধ্যে কোনও ব্যক্তি যদি কোনও অপরাধে অন্তত একবার আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকেন, অথবা একই ঘটনার অংশ নয় এমন কমপক্ষে ৩ টি পৃথক মামলায় চার্জশিটভুক্ত হয়ে থাকেন, তাকেও আটক করা যাবে।

দিদি, সবাই তো তাহলে গুন্ডা! মানে আপনার ভাইয়েরা। বেজায় পাজি এই ডবল ইঞ্জিন সরকারটা। □

অতিথি কলম

নরেন্দ্র মোদী

শক্তিশালী ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা রাষ্ট্রনায়ক ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এক শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ, আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ এবং সংবেদনশীল ভারত গড়ে তোলার প্রচেষ্টাই হবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি। ৬ জুলাই দিনটি জাতীয়তাবোধ ও নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শে বিশ্বাসী কোটি কোটি দেশবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করলাম। তাঁর সমগ্র জীবন সাহস, দেশপ্রেম এবং মাতৃভূমি ভারতমাতার প্রতি অটুট আত্মনিবেদনের এক অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত। তাঁর ব্যক্তিত্বে পাণ্ডিত্য, জনসেবা এবং উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধের এক অসাধারণ সমন্বয় ছিল। আধুনিক ভারতের খুব কম নেতার মধ্যেই একসঙ্গে এত গুণের সমাবেশ দেখা যায়। তিনি এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা জীবন সহজেই লাভ করতে পারতেন। তাঁর পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ। কিন্তু সমস্ত সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ত্যাগ ও দেশসেবার পথই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন— ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই কিংবা মানবিক সংকটের মোকাবিলায় কোথাও তিনি কখনো নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন না।

এই পথচলায় তাঁকে বহু গভীর ব্যক্তিগত শোকও সহ্য করতে হয়েছিল। প্রথমে তিনি তাঁর অল্পবয়সি সন্তানকে হারান এবং পরে তাঁর স্ত্রীও প্রয়াত হন। কিন্তু এই মর্মান্তিক বিয়োগবেদনার মধ্যেও তিনি কখনো ভেঙে পড়েননি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁর মনোবল অটুট ছিল। বরং তাঁর সংকল্প আরও দৃঢ় হয়েছে এবং দেশসেবার প্রতি তাঁর আত্মনিবেদন আরও গভীর হয়েছে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সর্বদা জাতীয় স্বার্থ এবং ভারতীয় মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন এবং এমন সব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, যা সমসাময়িক চিন্তাধারার থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হয়েছিলেন। তিনি শিক্ষাব্যবস্থায় এমন পরিবর্তন আনেন, যা জাতীয় স্বার্থ ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধীরে ধীরে তাঁর সংকল্প আরও দৃঢ় হয়েছে এবং দেশসেবার প্রতি তাঁর আত্মনিবেদন আরও গভীর হয়েছে।

তাঁর বিশ্বাস ছিল, আমাদের এমন ছাত্র-ছাত্রী গড়ে তুলতে হবে, যারা ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য হবে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের সর্ববৃহৎ লক্ষ্য ছিল ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করা। দেশভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বজায় রাখতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কয়েক বছর পরে একই উদ্দেশ্যে তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশ্নে জীবনপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। সেই সংগ্রামের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। সে সময় আচার্য বিনোবা ভাবে মন্তব্য করেছিলেন, 'ডঃ মুখোপাধ্যায় যে আদর্শে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন, সেই আদর্শের জন্যই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।' বহু দশক পরে, ২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ (এ) অনুচ্ছেদ

> ১৯৪২ সালের মেদিনীপুর ঘূর্ণিঝড়ের সময় ড: মুখোপাধ্যায় ত্রাণকার্যের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৩ সালে যখন বঙ্গপ্রদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে জর্জরিত, তখন তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দুর্গত মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। একদিকে তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্টে গভীরভাবে ব্যথিত ছিলেন, অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকদের নির্মম উদাসীনতায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধও ছিলেন।

বিলুপ্ত হওয়াকে তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে দেখা হয়।

যখন সমগ্র দেশে কংগ্রেসের একচ্ছত্র প্রভাব ছিল, তখন তিনি ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর উপলব্ধি ছিল দেশের এমন একটি নতুন রাজনৈতিক বিকল্পের প্রয়োজন যা ভারতের উন্নয়নের কথা বলবে আবার দেশের সাংস্কৃতিক শিকড়ের সঙ্গেও নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকবে। সম্ভবত এই ভাবনাকেই সামনে রেখে দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'প্রদীপ', অর্থাৎ মাটির দীপকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। একটি ছোট্ট প্রদীপ দেখতে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, ঘন অন্ধকার দূর করার অসাধারণ শক্তি তার মধ্যে নিহিত থাকে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্প ও সরবরাহমন্ত্রী হিসেবে তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্পোন্নয়নই নতুন ভারতের মানুষের মধ্যে সম্মানবোধ, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম। তাঁর উদ্যোগে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, সিন্ধ্রি সার কারখানার মতো আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হস্তচালিত তাঁত, কুটিরশিল্প, কারিগরি এবং বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের স্বার্থেরও এক দৃঢ় সমর্থক ছিলেন।

আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নকে সামনে রেখে যে সিন্ধ্রি সার কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য ডঃ মুখোপাধ্যায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, বহু দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা সরকারগুলি তার প্রতি চরম অবহেলা দেখিয়েছিল। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, আমাদের সরকার সেই কারখানাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে।

ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে আলাপ-আলোচনায় ও মতবিনিময়কে মর্যাদা দিয়ে এসেছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেই গণতান্ত্রিক চেতনার এক উজ্জ্বল প্রতীক। তিনি জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রীসভায় যোগদান করেছিলেন এই বিশ্বাসে যে, স্বাধীনতার প্রাথমিক পর্যায়ে জাতি গঠনের দায়িত্ব রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে থাকবে। কিন্তু যখন তাঁর মনে হলো, জাতীয় গুরুত্বের কয়েকটি প্রশ্নে দেশের স্বার্থে ভিন্ন পথ অনুসরণ করা প্রয়োজন, তখনই তিনি পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি তাঁর সমগ্র জীবন সেই রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য উৎসর্গ করেন, যাকে তিনি দেশের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করতেন।

জহরলাল নেহরু যখন প্রথম সংবিধান সংশোধনী আনেন, তখন সেটিকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর প্রত্যক্ষ আঘাত বলে মনে করা হয়েছিল। ডঃ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তার অন্যতম ও সবচেয়ে সোচ্চার সমালোচক। তিনি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন কংগ্রেস কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে। অচিরে তাঁর সেই আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয়। প্রথম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে কংগ্রেস সরকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তির ওপরও গুরুতর আঘাত হানে।

ডঃ মুখোপাধ্যায় মানবিক সংবেদনশীলতা ও সেবামূলক মনোভাবের জন্যও সুপরিচিত ছিলেন। ১৯৪২ সালের মেদিনীপুর ঘূর্ণিঝড়ের সময় তিনি ত্রাণকার্যের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৩ সালে যখন বঙ্গপ্রদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে জর্জরিত, তখন তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দুর্গত মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। একদিকে তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্টে গভীরভাবে ব্যথিত ছিলেন, অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকদের নির্মম উদাসীনতায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধও ছিলেন। সেই বেদনা প্রকাশ করতে তিনি 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন। আজ আমাদের দেশ 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে তাঁর প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি হবে নিত্যদিন সেই ভারতের নির্মাণে অবিচলভাবে কাজ করে যাওয়া— যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন--- একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ, আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ এবং সংবেদনশীল ভারত নির্মাণ। দেশের যুবসমাজের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে তাঁরা এই লক্ষ্য পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন এবং এই সংকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে এগিয়ে আসবেন।

(লেখক ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী)

শোকসংবাদ

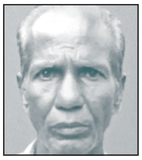

কোচবিহার জেলার বারোকোদালীর স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধি জগদীশ দাস গত ২০ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি হিন্দু জাগরণ মঞ্চ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

* * *

সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার সামাজিক সমরসতা বিভাগের সহ-সংযোজক দীপক চট্টোপাধ্যায়ের মাতৃদেবী শ্রীমতী বেলা চট্টোপাধ্যায় গত ৬ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৩ পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। এলাকায় তিনি বহু মন্দির নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ করেছেন।

* * *

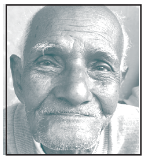

বর্ধমান জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক মুক্তিপদ কোঙার (নেপালদা) গত ১০ জুন ভাতারের কুলচণ্ডা গ্রামে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তিনি ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৪৫ সালে কলকাতায় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। গুসকরা মহকুমা সঙ্ঘচালকের দায়িত্বও পালন করেছেন।

ঝটকা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং একটি অমীমাংসিত দাবি

উতঙ্ক ব্যানার্জি

পশ্চিমবঙ্গ এই মুহূর্তের জন্য অনেক বছর অপেক্ষা করেছে। রাজ্যে একটি রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দল পরিচালিত সরকার— যাকে রাজনৈতিক মহল গত দুই দশক ধরে কল্পনাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। এটি সম্ভব হয়েছে মূলত একটি কারণে— পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু ভোটার অবশেষে একজন 'হিন্দু' হিসেবে ভোট দিয়েছেন। তাঁরা সেই বুথে গিয়ে তাঁদের ভোট দিয়েছেন যেখানে কোনো দলীয় কর্মী রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচার করেননি, যেখানে তৎকালীন শাসক দলের পেশীশক্তি বুঝিয়ে দিয়েছিল যে বুথ পর্যন্ত ভোট দিতে আসাটাই বিপদের— তবু তাঁরা ভোট দিয়েছেন। সেই ভোট বিনামূল্যে দেওয়া হয়নি।

প্রশ্ন এখন একটাই, নতুন সরকার তাঁদের উপর অর্পিত আস্থার সঙ্গে কী করবে। বড়ো সংস্কারের প্রয়োজন আছে— পুলিশ ব্যবস্থা, জমি, শিল্প। কিন্তু এমন কিছু ছোটো বিষয়ও আছে যা হিন্দু সমাজ বছরের পর বছর ধরে, মনে মনে এবং প্রকাশ্যেও, চেয়ে আসছে। তার মধ্যে একটি হলো ঝটকা জবাই।

যুক্তিটি জটিল নয়। ঝটকা হলো পশু জবাইয়ের সেই পদ্ধতি যা হিন্দুরা পালন করেন এবং শিখ মতে যা অপরিহার্য— একটিমাত্র দ্রুত, নিখুঁত আঘাতে। হালাল পদ্ধতিতে পশুর গলা আড়াই কোপে ধীরে ধীরে কাটা হয়, আর সেই সময় একটি নির্দিষ্ট মজহবি শব্দ উচ্চারণ করা হয়। একজন আস্তিক হিন্দুর আপত্তি সম্পূর্ণ আলাদা এবং আরও গভীর--- হালাল মাংস অন্য বিশ্বাসের নামে উৎসর্গীকৃত। যে হিন্দু তাঁর ধর্মকে সত্যিকার অর্থে মান্য করেন, তাঁর কাছে এই মাংস গ্রহণ করা একটি ধর্মীয় আঘাত। এটি অসুবিধার বিষয় নয়। এটি তাঁর নিজের রান্নাঘরে তাঁর বিশ্বাসের উপর আঘাত।

দশকের পর দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে এই বিষয়টিকে কোনো গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। যাঁরা প্রকাশ্যে এই দাবি তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রয়াত তপন ঘোষ— 'হিন্দু সংহতি'র প্রতিষ্ঠাতা, যিনি ২০২০ সালের জুলাই মাসে প্রয়াত হওয়ার আগে পর্যন্ত এই রাজ্যে হিন্দুদের অধিকারের জন্য বছরের পর বছর লড়াই করেছেন। তিনি শুধু বিষয়টি উত্থাপন করেই থামেননি। তিনি সাংগঠনিক অর্থ ব্যয় করে রাজ্যজুড়ে একাধিক হিন্দুকে ঝটকা কসাইখানা স্থাপনে আর্থিক সহায়তা করেছিলেন। রাজ্য সরকার তাতেও ভ্রূক্ষেপ করেনি। সমস্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত কসাইখানায় হালাল মাংসই উৎপাদন হতো, আর ঝটকা মাংস পাওয়ার প্রত্যাশী একজন হিন্দুকে বাজারে যা পাওয়া যায় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। হিন্দুদের চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে সরকার কোনো দিন খোঁজ নেয়নি, পরোয়াও করেনি।

এখানে যা প্রস্তাব করা হচ্ছে তা মাত্র কিছু নতুন কসাইখানার লাইসেন্স দেওয়ার বিষয় নয়। এই রাজ্যের বিদ্যমান কসাইখানাগুলির সিংহভাগকেই ঝটকা পদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য করতে হবে। নতুন কসাইখানা তৈরি হতে হবে এমন সংখ্যায় যা এই রাজ্যের হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি পৃথক পরিচালকদের সদিচ্ছা বা বাজারের ধীর পরিবর্তনের ভরসায় ছেড়ে দেওয়া যাবে না। এটিকে নিয়ন্ত্রণ বাধ্যবাধকতায় পরিণত করতে হবে--- রাজ্যের লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ব্যবহার করে এবং তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করে। নয়তো বর্তমান ও নতুন হালাল কসাইখানাগুলি কোনো বাধা ছাড়াই চলতে থাকবে। মুসলমান সম্প্রদায়ের হালাল মাংসের অধিকারে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন নেই। যা বদলাবে তা হলো এই রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় এমন মাংস পাবেন যা তাঁরা নির্মল বিবেকে গ্রহণ করতে পারবেন, এই নিশ্চয়তা নিয়ে যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কসাইখানায় রাজ্য সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিটি সত্যিই অনুসরণ করা হয়েছে। হিন্দুরা এরাজ্যে কোনো সংখ্যালঘু নয় যাদের ধর্মীয় খাদ্যাভাসকে প্রান্তিকভাবে স্বীকৃতি দিলেই চলে। তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে সাধারণ বিষয়ে তাঁদের ধর্মীয় অনুভূতি রক্ষা করা সরকারের দয়ার কাজ নয়। এটি সরকারের ন্যূনতম দায়িত্ব। এর একটি সাংবিধানিক ভিত্তিও রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদ প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে তাঁর ধর্ম স্বাধীনভাবে পালনের অধিকার দেয়। নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী আহার করা হিন্দু ও শিখ উভয় সমাজের ধর্মাচরণের অংশ। বিশ্বের বহু দেশে ইহুদিদের খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে 'কোশের' সার্টিফিকেশন রয়েছে। কেউ তাকে বৈষম্যমূলক বলেন না। এখানে যুক্তিটি আলাদা নয়।

নতুন সরকার যাই করুক না কেন, পরিচিত প্রত্যাশাগুলির মুখোমুখি হবে। পদক্ষেপ নেওয়ার রাজনৈতিক মূল্য আর না নেওয়ার মূল্য প্রায় সমান। পার্থক্য এইটুকুই যে, পদক্ষেপ নিলে যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁদের কিছু প্রত্যাশা পূরণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা এবার এত সংখ্যায় ভোট দিতে বের হননি শুধু সরকারি চিঠির লেটারহেড বদলাতে তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন এরাজ্যে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার জন্য। এটি তাঁদের সেই প্রত্যাশা পূরণের একটি সুযোগ। আশা করা যায় যে, এরাজ্যে হিন্দুদের মাথা নীচু করে থাকার দিন এবার শেষ হবে। □

পশ্চিমবঙ্গের ‘গুন্ডা দমন আইন, ২০২৬’

এরাজ্যে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনিবার্য অস্ত্র

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় অপরাধীরা যখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, তখন সাধারণ মানুষ ছিল অসহায়। সদ্য প্রণীত ‘গুন্ডা দমন আইন’ হলো সেই অসহায় মানুষকে মাফিয়ারাজের কবল থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

সাধন কুমার পাল

পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি একটি ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রশ্ন। দীর্ঘ ৩৫ বছরের বাম শাসন এবং পরবর্তী ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের রাজত্বে রাজ্যের অভ্যাসগত অপরাধীরা রাজনৈতিক আনুগত্যকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে প্রচলিত আইনকে ফাঁকি দেওয়ার, প্রমাণ না রেখেই অপরাধ করার, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করার এবং প্রশাসনের একাংশকে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত করার দক্ষতা রপ্ত করেছে। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যমান ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বা বিএনএস-এর বিধানগুলি এরাজ্যে অর্গানাইজড্ ক্রাইম বা সংগঠিত অপরাধ দমনে যথেষ্ট নয় বলে সরকার স্বীকার করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে ‘পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২৬’ বা ‘গুন্ডা দমন আইন’-এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট ও কর্ণাটকের মতো রাজ্যগুলিতে এই ধরনের আইন প্রয়োগ করে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, ইজরায়েলের মতো দেশগুলিতে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় প্রতিরোধমূলক আটক আইন বিদ্যমান। পশ্চিমবঙ্গের আইনের শাসন ফেরানোর লক্ষ্যে নবনির্বাচিত রাজ্য সরকারের কাছে এই নতুন আইন হতে চলেছে অপরিহার্য।

পশ্চিমবঙ্গে ‘গুন্ডা রাজনীতি’ নতুন নয়। ১৯৭৭ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে রাজ্যের মাটিতে এক বিশেষ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যেখানে অপরাধী ও রাজনীতিকের মধ্যে বিভেদরেখা প্রায় মুছে গিয়েছিল। দলীয় আনুগত্য থাকলে হত্যা, চাঁদাবাজি, জমি দখল কিংবা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের ঘটনায় রাজ্য প্রশাসন চোখ বন্ধ রাখত। প্রচলিত আইনে গ্রেপ্তার হলেও দলীয় প্রভাবে জামিন পেয়ে তারা পুনরায় অপরাধ জগতে ফিরে আসত।

২০২৬ সালের এপ্রিলে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তী পর্যায়ে সংঘটিত জেহাদি হিংসায় বহু সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস হওয়ার ঘটনা এই আইন প্রণয়নের তাৎক্ষণিক কারণ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন— প্রচলিত আইনে অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই, যে কারণে এই বিল এনেছে রাজ্য সরকার। প্রচলিত আইনে না থাকা বিভিন্ন ধারা এই নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি হলো,

(১) আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা-— কর্তৃপক্ষ বিচার বা অভিযোগ গঠন ছাড়াই কোনো ব্যক্তিকে ১২ মাস পর্যন্ত আটকে রাখতে পারবে।

(২) ‘গুন্ডা’ বলা হচ্ছে তাদের যারা অভ্যাসগতভাবে অসামাজিক কাজে লিপ্ত, ক্রিমিনাল গ্যাং (অপরাধী দল) বা সিন্ডিকেটের সদস্য, বিএনএস-এর ১১১ ও ১১২ ধারায় অভিযুক্ত, অথবা অস্ত্র, মাদক, মানবপাচার ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে জড়িত। ‘অসামাজিক কার্যকলাপ’-এর আওতায় আতঙ্ক সৃষ্টি, জনশৃঙ্খলা ভঙ্গ, অবৈধ দখল, সম্পত্তি ধ্বংস এবং বালি, খনিজ, বনজ সম্পদের চুরি অন্তর্ভুক্ত।

(৩) জেলাশাসক বা পুলিশ কমিশনার কোনো ‘গুন্ডা’কে এক বছরের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় প্রবেশে নিষেধ করতে পারবেন।

(৪) দাঙ্গা বা হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মূল্য উদ্ধারে অভিযুক্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও নিলামের ব্যবস্থা রয়েছে।

(৫) আটককৃত ব্যক্তি সাধারণত উপদেষ্টা বোর্ডে নিজের আইনজীবী রাখতে পারবেন না। এই ধারাটি বিতর্কিত হলেও রাজ্য সরকারের দাবি, সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এটি প্রয়োজনীয়।

ফঃ ২

প্রচলিত আইন থাকা সত্ত্বেও বিশেষ আইনের যৌক্তিকতা রয়েছে। সরকারের মতে, বর্তমান বিএনএস-এর ধারাগুলি যথেষ্ট নয় কারণ ঃ

(১) প্রচলিত আইনে অপরাধ প্রমাণ করতে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রয়োজন, যা গুন্ডাদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব।

(২) অধিকাংশ অপরাধ জামিনযোগ্য, ফলে গ্রেপ্তারের পরপরই জামিন পেয়ে তারা পুনরায় অপরাধে ফিরে আসে।

(৩) বিদ্যমান আইনে দাঙ্গায় ধ্বংস হওয়া সরকারি সম্পত্তির মূল্য আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা নেই।

(৪) রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় প্রশাসনের অংশ নিজেই অপরাধীদের সঙ্গে মিলে কাজ করে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিদ্যমান আইনে অপরাধীদের সম্পত্তির মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই। এই আইন প্রয়োজন কারণ রাজার দায়িত্ব জনগণের সম্পত্তি রক্ষা করা।'

ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কার্যকারিতা ও অপপ্রয়োগ ঃ

কর্ণাটক ঃ ১৯৮৫ সালে 'গুন্ডা আইন' কার্যকর হয়। ২০২৩ সালে ম্যাঙ্গালুরুতে ৬০ জন দাগি অপরাধীর বিরুদ্ধে নির্বাসন আদেশ দেওয়া হয়, যা অপরাধ কমাতে সাহায্য করেছে। তবে বিচারবিভাগীয় পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, অনেক ক্ষেত্রে খালাস পাওয়ার পরও পুরনো মামলা বিবেচনার মাধ্যমে অপরাধীদের আটক করা হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশ ঃ সংগঠিত অপরাধ রুখতে উত্তরপ্রদেশে ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে 'উত্তরপ্রদেশ গ্যাংস্টার আইন' এবং 'উত্তরপ্রদেশ সংঘটিত অপরাধ দমন আইন'। ২০১৫ সালে 'গুজরাট সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ এবং সংঘটিত অপরাধ দমন আইন' চালু হয়েছে

বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরনের আইন অপপ্রয়োগের ঘটনা থাকলেও সেগুলি তুলনামূলকভাবে নগণ্য এবং উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

শুধু ভারত নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিরোধমূলক আটকের আইনি কাঠামো রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট-এর অধীনে সন্দেহভাজনদের দীর্ঘদিন আটকে রাখার ক্ষমতা রয়েছে।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ঃ সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আইনে ২৮ দিন পর্যন্ত প্রতিরোধমূলক আটকের বিধান ছিল।

ইজরায়েল ঃ প্রশাসনের দ্বারা প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন বা প্রতিরোধমূলক আটকের মাধ্যমে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের বিচার ছাড়াই আটকে রাখা হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক প্রক্রিয়া ও আইনি পর্যবেক্ষণ থাকলে এই আইনগুলি অপরাধ দমনে অত্যন্ত কার্যকরী।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আইনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

২০২৫ সালের ধুলিয়ান হিংসা ও ২০১৯ সালে সিএএ-বিরোধী আন্দোলনে ব্যাপক সম্পত্তি ধ্বংসের ঘটনার প্রেক্ষিতে মূলত এই আইন প্রণয়ন করেছে নবনির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এছাড়া বালি, খনিজ ও বনজ সম্পদ চুরি সরকারি রাজস্বের ব্যাপক ক্ষতি করছে, যা প্রচলিত আইনে ঠেকানো সম্ভব হচ্ছিল না।

এই আইন প্রয়োজন কারণ এটি প্রতিরোধমূলক, ফলে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই সম্ভাব্য অপরাধী বা গুন্ডাদের আটক রাখা যাবে। 'সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত' অপরাধীদের জন্য বড়ো অর্থনৈতিক সতর্কবার্তা তৈরি করবে। নির্বাসন আদেশের মাধ্যমে গুন্ডাকে তার কর্মকাণ্ডের এলাকা থেকে বহিষ্কার করা সম্ভব। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণে যে অপরাধীদের ভয়ডর নেই, এই আইন তাদের সেই রক্ষাকবচ কেড়ে নেবে।

বিরোধীরা আইনটিকে '২০২৬ সালের রাওলাট আইন' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকি প্রশ্ন তুলেছেন— 'এটি কি গুন্ডা দমন করবে, নাকি বিরোধী মতামত দমন করবে?'

এই আইনের আওতায় কেবল অভ্যাসগত অপরাধী এবং জনশৃঙ্খলা (পাবলিক অর্ডার) ভঙ্গের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা পড়বেন। সাধারণ নাগরিক, সাংবাদিক বা বিরোধী দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে এটি ব্যবহৃত হবে না। আইনে উপদেষ্টা বোর্ড ও হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

এই আইনের সাফল্য নির্ভর করবে কীভাবে প্রয়োগ করা হয় তার উপর। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নজর দেওয়া প্রয়োজন—

(১) তদন্ত প্রক্রিয়া ও প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন-এর ক্ষেত্রে 'গুন্ডা' ও 'অসামাজিক কার্যকলাপ'-এর সংজ্ঞা স্পষ্ট করতে হবে। (২) প্রতিটি আটকের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। (৩) আটককৃত ব্যক্তিকে নিজের আইনজীবী রাখার সুযোগ দিতে হবে। (৪) আটকের সময়কাল (১২ মাস) পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

এই আইন যদি সঠিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়, তবে সংগঠিত অপরাধ দমনে এটি অত্যন্ত কার্যকরী হবে। কিন্তু যদি প্রচলিত আইনের 'শর্টকাট' হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে তা উৎপীড়নের হাতিয়ার হতে পারে। বিচারপতিরা বারবার বলেছেন, এই আইন একটি ব্যতিক্রমী ক্ষমতা, তাই এর প্রয়োগে অতিরিক্ত প্রশাসনিক সতর্কতা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে আইনশৃঙ্খলাহীনতার জ্বালা সহ্য করেছে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় অপরাধীরা যখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, তখন সাধারণ মানুষ ছিল অসহায়। সদ্য প্রণীত 'গুন্ডা দমন আইন' হলো সেই অসহায় মানুষকে মাফিয়ারাজের কবল থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

যদি সঠিকভাবে এই আইন প্রয়োগ করা যায় তবে এরাজ্যে আইনের শাসন নিশ্চিতভাবে বলবৎ হবে। ▯

গুন্ডামুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে গুন্ডা দমন আইনের প্রয়োজন ছিল

আনন্দ মোহন দাস

ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা হলো— 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন'। ভারতীয় পরম্পরা হলো অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তিকে বিজয়ী করা। আদি অনন্ত কাল ধরে ভারতবর্ষে এই ঐতিহ্য বজায় রয়েছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণরূপী অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাধ্যমে দানবীয় শক্তির প্রতীক কৌরবদের পরাজিত করে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অসুররূপী মহিষাসুরকে বধ করতে মা দুর্গার আবির্ভাব ঘটেছিল। সমাজে যখন অত্যাচার, অনাচার ও অপরাধ বেড়েছে অর্থাৎ অধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তখনই স্বয়ং শ্রীভগবান তার প্রতিকার করেছেন। এটাই সনাতন রীতি। বর্তমান যুগেও এই ধরনের দানবীয় শক্তি বা দুষ্ট শক্তি এবং অসামাজিক লোকজন প্রতিনিয়ত সমাজে বিদ্যমান থেকে নানা অত্যাচার ও অনাচার করে চলেছে। অত্যাচার ও অনাচারের মাত্রা চরম সীমায় পৌঁছে গেলে ঈশ্বর যে কোনোভাবে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন।

বর্তমান যুগেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে দুষ্টের দমন না করে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও জনগণের মঙ্গল করা সম্ভব নয়। এই ধরনের অশুভ শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ না ঘটালে বা অপরাধীদের শাস্তির বিধান না থাকলে সামাজিক উন্নয়ন বা শিষ্টের পালন সুনিশ্চিত করা অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে বিগত পঞ্চাশ বছরে সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসনে রাজনীতির অপরাধীকরণ, হিংসা, নারী সুরক্ষা ও আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে। অশুভ শক্তির দাপটে অত্যাচার ও অনাচার অধিক মাত্রায় বেড়েছে। অরাজক শক্তির কার্যকলাপ এরাজ্যের সামাজিক পরিবেশকে কলুষিত ও কলঙ্কিত করেছে। বিগত ৩৪ বছরের বাম শাসনে রাজ্যে মূলত হিংসাত্মক কার্যকলাপের আমদানি ঘটেছে। বর্ধমানের সাঁইবাড়িতে মায়ের সামনে ছেলেকে হত্যা করে মাকে রক্ত মাখানো ভাত খাওয়ানো, হুগলীর জাঙ্গিপাড়ায় মায়ের সামনে টাঙ্গি, বল্লম দিয়ে দুই ছেলের হত্যা এবং বিজন সেতুতে ১৭ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, স্বামীদের হত্যা করে বাড়ি বাড়ি থান কাপড় পাঠানো— সবই সিপিএমের জঘন্যতম অপরাধের নমুনা। এগুলো তাদের অপশাসনের হিমশৈলের চূড়া মাত্র যা বর্তমান প্রজন্মের অনেকেরই অজানা।

> জনগণের নিরাপত্তার প্রয়োজনে গুন্ডাদের প্রতিরোধমূলক আটক করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন জেলার ডিএম (জেলাশাসক) ও এসপি (পুলিশ সুপার)-রা। সুতরাং এই আইনে ভদ্রলোকদের ও রাজনীতিবিদদের আশঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বলে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন।

পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেসও এই অপরাধীকরণকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। তৃণমূল জমানায় রাজ্যজুড়ে কায়েম হওয়া গুন্ডা ও মাফিয়ারাজের ফলে দুর্নীতি ও অরাজকতায় রাজ্য সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা রাজ্যে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। এরাও বিরোধী রাজনৈতিক পরিসরকে নির্মূল করতে এরাজ্যে সমাজ ও রাজনীতির ব্যাপক দুর্বৃত্তায়ন ঘটিয়েছে। তৃণমূলি রাজনৈতিক মাফিয়ারা দুষ্কৃতীদের দ্বারা অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করে সমাজে

গুন্ডা ও মাফিয়ারাজ কায়েম করেছে।

এর ফলে সমাজে গুন্ডা ও দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব বেড়েছে। অন্যায় অত্যাচার ও সমাজবিরোধীদের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের রাজত্বে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলাও তলানিতে ঠেকেছে। এদের আমলেই শাজাহান, হুমায়ুন, জাহাঙ্গির ও শওকত মোল্লাদের মতো গুন্ডাদের দাপট বেড়েছে যা তৃণমূল জমানায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির প্রমাণ বহন করছে।

বিগত দুই শাসকই দলীয় শাসন কায়েম করতে ও ভোটব্যাংক বজায় রাখতে আইনের শাসনকে শিকেয় তুলে গুন্ডারাজ ও দলতন্ত্র কায়েম করেছিল। তাই সমাজের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনীতির অপরাধীকরণ রুখতে কঠোর শাস্তির বিধান না থাকায় সমাজের মধ্যে অপরাধ করার প্রবণতা অধিক মাত্রায় বেড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ক্রিয়াশীল এই অশুভ শক্তিকে পরাভূত করতে ও রাজ্যের ভাবমূর্তি ফেরাতে 'গুন্ডা দমন আইন' অত্যন্ত জরুরি ছিল। সেজন্য যথার্থ ভাবেই বর্তমান রাজ্য সরকার দুষ্কৃতী ও গুন্ডাদের দমন করতে সম্প্রতি বিধানসভায় গুন্ডা দমন বিল পেশ করে। গত ২৯ জুন রাজ্য বিধানসভায় পেশ হয়— 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফ্‌টি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, ২০২৬' ও 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইন্টেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬'। প্রসঙ্গত এই ধরনের বিল ইতিমধ্যে পাশ হয়েছে মহারাষ্ট্র, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে। এই বিলে আগের আইনের বেশ কিছু ফাঁকফোকর দূর করে অপরাধীদের কড়া শাস্তি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিল পেশের পর ভোটাভুটির মাধ্যমে এটি আইনে পরিণত হয়। এর আগে কখনো সিএএ-বিরোধী আন্দোলন, কখনও ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলনের নামে এরাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করার ধারাবাহিক প্রবণতা প্রত্যক্ষ করেছে রাজ্যবাসী। উপযুক্ত শাস্তির অভাবে গুন্ডা, দুষ্কৃতী ও জেহাদিদের দ্বারা রেলওয়ে স্টেশন ভাঙচুর ও রেললাইন অবরোধ করে ট্রেন জ্বালানো, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা স্বাভাবিক ঘটনায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অশুভ শক্তির গুন্ডামি ও আস্ফালনের ফলে পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি, কাটোয়া, হাঁসখালি, সন্দেশখালি, আরজি করে এরাজ্যে নারীদের সম্মান ও সুরক্ষাও ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। তাই এই ধরনের অসামাজিক শক্তিকে বিনাশ করতে বর্তমান আইনে অত্যন্ত কড়া শাস্তির বিধান রয়েছে। জেল যাত্রা ছাড়াও দোষীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ধারা এই আইনে সংযোজিত হয়েছে। গুন্ডা মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে এই ধরনের কড়া আইনের প্রয়োজন ছিল। গত ২৯ জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গুন্ডা মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে উপরোক্ত বিল দু'টি পেশ করেন। এই বিল দু'টির ওপর রাজ্য বিধানসভায় আলোচনার পর ১৭৬-৪১ ভোটে পাশ হয়ে বিল দু'টি আইনে পরিণত হয়। এর মধ্যে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফ্‌টি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ অ্যাক্ট, ২০২৬'-কেই মূলত 'গুন্ডা দমন আইন' হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। ২০ জন বিধায়ক ভোটদানে বিরত থাকেন।

অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে কোনো ফৌজদারি আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো অপরাধ সংগঠিত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রতিরোধমূলক প্রভাব বা ডেটারেন্ট এফেক্ট। ডেটারেন্স অফ ল'-এর ধারণা অনুযায়ী শাস্তির ভয় মানুষকে আইন ভাঙা থেকে বিরত রাখে। এই ধারণাটি দু'ভাবে কাজ করে— (১) জনগণকে কড়া পানিশমেন্ট বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে 'প্রিভেনশন অফ ক্রাইম' বা নতুন অপরাধ সংঘটিত হওয়া রুখে দেওয়া (জেনারেল ডেটারেন্স বা সাধারণ প্রতিরোধ) এবং (২) দণ্ডিত অপরাধীকে শিক্ষা দেওয়া যাতে সে ওই কাজের পুনরাবৃত্তি না করে (স্পেসিফিক ডেটারেন্স বা নির্দিষ্ট প্রতিরোধ)। এই বিলে জনগণের সুরক্ষার স্বার্থে যে কোনো সম্ভাব্য অপরাধী ও গুন্ডাকে ১২ মাস পর্যন্ত প্রতিরোধমূলক আটক করা যাবে। তবে এই ধরনের গ্রেপ্তারির নয় সপ্তাহের মধ্যে হাইকোর্টের প্রাক্তন বা কর্মরত বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের একটি উপদেষ্টা পর্ষদের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে। এই আইনে অপরাধীদের জামিনের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় আশ্বাস দিয়েছেন যে, এই আইনের বিভিন্ন ধারা অপপ্রয়োগের কোনোরকম সম্ভাবনা নেই। কারণ জনগণের নিরাপত্তার প্রয়োজনে গুন্ডাদের প্রতিরোধমূলক আটক করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন জেলার ডিএম (জেলাশাসক) ও এসপি (পুলিশ সুপার)-রা। সুতরাং এই আইনে ভদ্রলোকদের ও রাজনীতিবিদদের আশঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বলে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন। কেবলমাত্র সমাজবিরোধী, গুন্ডা ও অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে যুক্তদের বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ হবে। কারণ বর্তমান ফৌজদারি আইনে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই এবং বেশ কিছু আইনি ধারা মূলত অকার্যকরী। এই বিলের লক্ষ্য হলো— যে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দাঙ্গাকারীর দ্বারা জনগণের মধ্যে আতঙ্ক, ভয়, নিরাপত্তাহীনতা, সন্ত্রাস সৃষ্টি, আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করা, সংগঠিত অপরাধ, হিংসা, জীবন ও সম্পত্তিহানির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। এছাড়াও এই আইনের উদ্দেশ্য হলো— অবৈধ খনন, অবৈধভাবে খনিজ পদার্থ উত্তোলন, বেআইনি বালি খাদান, বন ও বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত সামাজিক অপরাধমূলক কাজকে প্রতিহত করা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে আন্দোলনের নামে সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করলেও প্রচলিত আইনে কোনোরকম ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই। এর ফলে দাঙ্গাকারীরা অবাধে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। কিছুদিন পরে জামিন নিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে যায় এবং পুনরায় একই ধরনের অপরাধমূলক কাজ করতে থাকে। সেজন্য অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষতিপূরণ আদায় করার ব্যবস্থা এই আইনে রয়েছে।

তবে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের কোন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে পরিচালিত তিন সদস্যের একটি কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। সম্পত্তির মূল্যায়ন ও ক্ষতিপূরণের বিষয়ে তাঁরাই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে এই ধরনের বিল অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগ বিশেষ সাধুবাদযোগ্য। □

পশ্চিমবঙ্গে গুন্ডাদমন আইন পাশ করানো মানুষের দাবি ছিল

এনাফ ইজ এনাফ। এই ধরনের লোকদের শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে। গুন্ডারাজ শেষ হয়েছে। এখন রাজ্য চলবে আইনের শাসনে।

মণীন্দ্রনাথ সাহা

রাজ্যে অসামাজিক কার্যকলাপ দমন এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। তৃণমূল আমলে রাজ্যে দেদার লুটপাট, আন্দোলনের নামে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস থেকে তোলাবাজি, দাদাগিরিতে অতিষ্ঠ রাজ্যবাসী। এই আবহেই ২৯ জুন বিধানসভায় ধ্বনি ভোটে পাশ হয়েছে— 'পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অব অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল-২০২৬'। সংক্ষেপে যাকে বলা হচ্ছে গুন্ডা দমন বিল।

এদিন বিধানসভায় গুন্ডা দমন বিলটি পেশ করেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা। বিলটির পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্যের পর ধ্বনিভোট হয়। বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ১৭৬ জন বিধায়ক। বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন ৪১ জন। ধ্বনিভোটে অংশ নেননি ২০ জন বিধায়ক এবং ভোটদানে বিরত ছিল কালীঘাট তৃণমূল শিবির।

বিলে উল্লেখ করা হয়েছে, সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করতে পারে বা মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারে, এমন সব কাজই সমাজবিরোধী কাজের সংজ্ঞার মধ্যে আনা যাবে। এর মধ্যে রাখা হয়েছে শৃঙ্খলা নষ্ট করা, মানুষের জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি করা, আইনসম্মত ব্যবসাবাণিজ্য বা পেশায় বাধা দেওয়া, বেআইনিভাবে কারও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা, সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করা, খনি, বালি, পাথর বা প্রাকৃতিক সম্পদ বেআইনিভাবে উত্তোলন করা, বন্যপ্রাণী বা বনজ সম্পদের ক্ষতি করার মতো বিষয়ও।

এদিন বিলটি পেশের পর এই আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজ্যের পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে সন্ত্রাসের বিবরণ তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দেশের মধ্যে প্রথম সিএএ বিরোধী মিছিল হয়েছিল এই পশ্চিমবঙ্গেই। সিঁথির মোড় থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল করে পশ্চিমবঙ্গে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর গোটা রাজ্যে আগুন জ্বলল। চাঁচলের সামসীতে রেললাইন উপড়ে দেওয়া হয়েছিল। বেলডাঙ্গা স্টেশন জ্বলেছে, ৫০০ হকারের দোকান পুড়েছে। নিমতিতায় ৬৮ দোকান লুট, হিন্দুদের বাড়িতে ঢুকে কোপানো হয়েছিল, খেসারত দিতে হয়েছিল হরগোবিন্দ দাসের পরিবারকে। রেজিনগর স্টেশনে আগুন ধরিয়েছে। নবান্ন থেকে একটু দূরে সাঁতরাগাছিতে ৩৭টা বাসে আগুন ধরানো হয়েছিল, তার মধ্যে ২২টা ছিল সরকারি বাস। বেছে বেছে মোথাবাড়িতে হিন্দু দোকানে আগুন ধরানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন— 'আমি তখন পরিবহণ মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করলাম, সরকারি বাস পুড়িয়ে দিচ্ছে। বললেন, কিছু করা যাবে না। পুলিশকে বলেছি ওদের সঙ্গে কথা বলতে।' মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা শুনে অধিবেশন কক্ষ জুড়ে ধ্বনিত হতে থাকে 'শেম শেম'। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'এই আইনের আওতায় অপরাধীদের শুধু হাজতবাস নয়, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষতিপূরণ উশুল করা যাবে।'

শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক তথা পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, গরিবের টাকা যাঁরা শোষণের চেষ্টা করবেন, তাঁদের শাস্তি দেওয়ার জন্যই এই বিল অত্যন্ত দরকার। আর কেউ সরকারি সম্পত্তির দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পাবে না। আমরা এমনই ব্যবস্থা করছি। এই বিলের মাধ্যমে পুলিশকে টেবিলের তলা থেকে বের করে গুন্ডাদের টেবিলের তলায় ঢোকানোর সময় এসেছে।'

আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক তথা পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'উসকানিমূলক মন্তব্য করলে সেটাও গুন্ডাদমন আইনের আওতায় আসবে। তিনি আরও মনে করিয়ে দেন— 'সাম্প্রতিক অতীতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন— 'তিনি মাঝখান থেকে সরে গেলে একটা সম্প্রদায় এক সেকেন্ডে সব তছনছ করে দিতে পারে।' আক্ষেপের সুরে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন— 'যে সরকার ভোট পরবর্তী হিংসাকে অপরাধ মনে করে না, সে দলের নেতা গাড়ির বনেটে দাঁড়িয়ে ডিজে বাজানোর হুমকি দেন, সেই দলের হাতে পশ্চিমবঙ্গ শাসনের দায়িত্ব ছিল। এ যেন ঠিক বিড়ালকে মাছ পাহারা দেওয়ার মতো ঘটনা।'

ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি পুলিশের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, 'বিলে বলা হচ্ছে সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিরোধীরা মত প্রকাশ করলে সন্দেহ করা হবে না তো?' তাঁর পরামর্শ, 'সত্যি সত্যি যাঁরা দোষী, তাদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হোক। নির্দোষরা যাতে কোনোও ভাবেই এরজন্য ভুক্তভোগী না হয়।'

এতদিন মুসলমান ভোটারদের মন ভোলাবার জন্য দেশের সেকুলারপন্থী হিন্দু নেতারা টুপি পরা, হিজাব পরা, নমাজ পড়া ছাড়াও অন্য যেকোনো মুসলমান আচার আচরণ অনুসরণ করতে বাকি রাখেননি। নিজ ধর্ম বিসর্জন দিয়ে সেকুলার অর্থাৎ হিন্দু ধর্মদ্বেষী হয়েছেন, অযাচিতভাবে ইসলামি মজহবি আচার রক্ষার জন্য জান কবুল করেছেন। বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দুহাতে সাহায্য করেছেন, বসতি গড়তে দিয়ে ভোটব্যাংক তৈরি করেছেন এবং তাদের নিরাপদে দুষ্কর্ম চালাবার পথ দেখিয়েছেন। বিনিময়ে মুসলমান ভোটাররাও বিগত ৪৯ বছর ধরে এদের বাক্স উপুড় করে ভোট দিয়েছে আর আদায় করে নিয়েছে নানাবিধ অবৈধ সুযোগ সুবিধা। এইরকম তোষণের ফলেই এরাজ্যে তৈরি হয়েছিল— হাতকাটা ন্যাপলা, কানকাটা ঢ্যাপলা আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে মজিদ মাস্টারদের মতো অসংখ্য সম্পদেরা। তাদের পরবর্তী পনেরো বছরে তৈরি হয়েছে— শেখ শাহজাহান, শওকত মোল্লা, জাহাঙ্গির তথা পুষ্পা-সহ হুমায়ুনের মতো অজস্র গুন্ডা ও সন্ত্রাসবাদী। পূর্বতন শাসকদের আদরে আদরে বাঁদর হয়ে এরা যা খুশি তাই করে গেছে এবং এখনও করছে বা বলছে। হুমায়ুন তো মুর্শিদাবাদের ৩০ শতাংশ হিন্দুকে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলার পরেও সরকার কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। আর এবারে তার উক্তি— '...আমার মাথা গরম হলে লক্ষ লক্ষ মুসলমান রাস্তায় নামিয়ে এমন 'স্যাটাভাঙ্গা' মার দেব যে বিজেপির ঝান্ডা ধরার লোক থাকবে না। আমি এসপি বা জেলাশাসককে ভয় করি না...' বলার পরেও এখনো বর্তমান সরকার হুমায়ুনের 'মাথা ঠাণ্ডা' করার পদক্ষেপ নেয়নি।

যদিও এই গুন্ডাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন— 'এনাফ ইজ এনাফ। এই ধরনের লোকদের শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে।' তিনি আরও বলেছেন, হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। রেজিনগরের দুটি ঘটনায় কেস নম্বর ২১৯ ও ২২৬ এবং শক্তিপুর থানায় আরও একটি মামলা রুজু হয়েছে। বিএনএস-এর ১৫২, ১৯২, ১৯৬, ১৯৭, ২২৪, ২৯৯, ৩৫১ (২), ৩৫৩ এবং ১৭৬ ধারায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

রাজ্যের সাধারণ মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসবাণীতে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে অপেক্ষায় রয়েছেন এই ভেবে যে দেশভাগের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা এ পর্যন্ত স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারেননি। তাঁরা যেন পরাধীন দেশের নাগরিক হয়েই বেঁচে ছিলেন। দীর্ঘ বছর তাঁরা শয়তান হিন্দুদ্রোহী রাজনীতিকদের খপ্পরে পড়ে বিভিন্নভাবে বিভক্ত হয়ে থাকার জন্যই তাঁদের ভুগতে হয়েছে। শেষপর্যন্ত তারা শয়তানদের চালাকি বুঝতে পেরে এবারে ৯২ শতাংশ হিন্দু একজোট হয়ে নতুন সরকার নিয়ে এসেছেন। আর সরকারও তার প্রতিশ্রুতি মতো কাজ শুরু করার জন্য হিন্দুরা অত্যন্ত আশাবাদী যে এখন থেকে হিন্দুরা স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন।

দেশভাগের পর থেকেই গ্রামপ্রধান পূর্ববঙ্গের এক একটি গ্রাম হিন্দুদের মান-সম্মান রক্ষার্থে দেশত্যাগের দরুন যেমন হিন্দুশূন্য হয়ে গেছে, ঠিক তেমনিভাবে সেইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বুকেও। কয়েক বছর আগে একটা সংবাদপত্রের খবরে জানা গেছে বাংলাদেশের মতোই পশ্চিমবঙ্গের ৩৮ হাজার গ্রামের মধ্যে ৮ হাজার গ্রামই হিন্দুশূন্য হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ মুসলমানদের দৌরাত্ম্যে ওইসব গ্রামের হিন্দুরা বাড়িঘর, জমিজমা, ব্যবসাপত্র ছেড়ে বা জলের দরে বেচে অন্যত্র চলে গেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো বিগত ৫০ বছর ধরে পূর্বতন হিন্দু বিদ্বেষী, ভারত বিদ্বেষী সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী ভারতীয় গ্রামগুলিতেই এই ধরনের হিন্দু বিতাড়নের ঘটনা ঘটছে পরিকল্পিতভাবে। ফলে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার মুসলমান গ্রাম ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী হিন্দুশূন্য ও সম্পূর্ণ মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম মিলে ভারত ও বাংলাদেশ এই দুটি পৃথক দেশের মধ্যে মজহবি জনভিত্তিক সীমারেখা মুছে গিয়েছে। প্রকারান্তরে বলা যায়, এই দুই বঙ্গের মুসলমান এলাকা একাকার হয়ে বাংলাদেশের জনভিত্তিক সীমানা পশ্চিমবঙ্গের ২৫ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে গেছে।

অস্বীকার করার উপায় নেই, পশ্চিমবঙ্গে ৩০ বছর কংগ্রেসি শাসনেও যে ঘটনা ঘটতে পারেনি অর্থাৎ সীমান্তবর্তী হিন্দু প্রধান গ্রামগুলিতে হিন্দুরা নিরাপদে বসবাস করতে পেরেছিল, মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর জোর জুলুম করতে সাহস পায়নি। কিন্তু পরবর্তী সিপিএম শাসনে শাসকদলের মদতে মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। আর তার পরবর্তীতে তৃণমূল শাসনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে বাংলাদেশ থেকে দলে দলে মুসলমান এসে সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলোতে স্থানীয় মুসলমানদের মদতে বাড়িঘর বেঁধে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে এবং অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দু প্রধান গ্রামগুলি মুসলমানপ্রধান গ্রামে পরিণত হয়। আর এদের সাহসে ভর করেই শাহজাহান, শওকত, পুষ্পা, হুমায়ুনরা রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের এবং বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়ার সাহস পাচ্ছে।

এবার সরকারের সামনে সময় এসেছে— শক্ত হাতে গুন্ডা দমন আইনের সাহায্যে গুন্ডাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে এখন আর এই রাজ্যে আগের মতো গুন্ডারাজ চলবে না। কারণ গুন্ডারাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন রাজ্য চলবে আইনের শাসনে। রাজ্যবাসী আগামীদিনে সেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা দেখার অপেক্ষায় রইলেন। □

পশ্চিমবঙ্গ বাজেট ২০২৬-২৭

‘উন্নত পশ্চিমবঙ্গ’ নির্মাণের পথে নতুন যাত্রা

ডঃ ধনপত রাম আগরওয়াল

(দ্বিতীয় পর্ব)

পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬-২৭ সালের বাজেটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এটি উন্নয়নকে সরকারি ব্যয়বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পরিবর্তে এরাজ্যের শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানকে এক সুসংহত অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আনার চেষ্টা করেছে। গত কয়েক দশকে রাজ্যের অর্থনীতি অনেকটাই ভোগভিত্তিক ব্যয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল। নতুন বাজেটে সেই প্রবণতা থেকে সরে এসে উৎপাদন, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানকে দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে কর্মসংস্থান। সরকার পর্যায়ক্রমে এক লক্ষ শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ, পুলিশ বিভাগে নতুন পদ সৃষ্টি এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। পাশাপাশি যুব সমাজকে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাজ্যের বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের কাছে এই ঘোষণাগুলি নিঃসন্দেহে আশার সঞ্চার করে। তবে শেষ পর্যন্ত নিয়োগের গতি ও স্বচ্ছতাই এই প্রতিশ্রুতির প্রকৃত সাফল্য নির্ধারণ করবে।

কৃষিক্ষেত্রে সরকার ধারাবাহিকতার পথেই হেঁটেছে। ‘কৃষকবন্ধু’ ও ‘বাংলা শস্যবিমা’ প্রকল্প বজায় রাখার পাশাপাশি কেন্দ্রের ‘প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি’ প্রকল্পের অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা, সেচে বিদ্যুৎ ভরতুকি এবং ফসল বিমার পরিধি বাড়ানোর উদ্যোগ কৃষকের আয় সুরক্ষার প্রতি সরকারের অঙ্গীকারকেই তুলে ধরে। কৃষি এখনও পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবিকার প্রধান অবলম্বন। তাই কৃষিকে লাভজনক করে তুলতে না পারলে শিল্পায়নের সুফলও সর্বস্তরে পৌঁছাবে না—এই বাস্তবতা বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে আইআইটি, আইআইএম, দু'টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি জনজাতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব শুধু নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার পরিকল্পনা নয়; এটি উচ্চশিক্ষায় ভৌগোলিক বৈষম্য কমানোর লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। দীর্ঘদিন ধরে কলকাতাকেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষার যে প্রবণতা ছিল, এই উদ্যোগ তা কিছুটা হলেও পরিবর্তন করতে পারে।

স্বাস্থ্য পরিষেবাতেও বাজেটে বিস্তৃত পরিকল্পনা দেখা যায়। উত্তরবঙ্গে এইমস্ ও ক্যানসার হাসপাতাল, একাধিক নতুন মেডিক্যাল কলেজ, অতিরিক্ত এমবিবিএস আসন এবং পৃথক আয়ুষ বিভাগের ঘোষণা স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার ইঙ্গিত দেয়। একই সঙ্গে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পকে সমগ্র রাজ্যে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত এরাজ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পরিবর্তন, কারণ এর ফলে বহু নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবার উন্নত চিকিৎসার আর্থিক সুরক্ষা পাবে।

পরিকাঠামো উন্নয়নেও উচ্চাভিলাষী রাজ্য বাজেট। কল্যাণীর কাছে নতুন গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর, মালদহ, বালুরঘাট ও পুরুলিয়ায় বিমানবন্দর, প্রায় ত্রিশ হাজার কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ, দুর্গাপুর-আসানসোল-শিলিগুড়ি মেট্রো প্রকল্পের সম্ভাব্য সমীক্ষা এবং ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ থেকে স্পষ্ট যে, সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে দেখছে। কারণ— শিল্প, পর্যটন কিংবা কৃষি— কোনো ক্ষেত্রেই শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বন্দর উন্নয়নের ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলেছে। পূর্ব মেদিনীপুরে নতুন গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা শুধু একটি পরিকাঠামো প্রকল্প নয়--- এটি পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ব ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের অংশ বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ রাজ্যের আর্থিক পরিকাঠামোকে নতুন প্রাণ দিতে পারে, যদিও তা বাস্তবায়নের জন্য সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা এখনও অপেক্ষমাণ।

এই বাজেটে 'ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, ওয়ান প্রোডাক্ট' (ওডিওপি)-এর ধারণাকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলার নিজস্ব উৎপাদন ও ঐতিহ্যকে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করার এই ভাবনা গ্রামীণ অর্থনীতিকে নতুন গতি দিতে পারে। ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, কলকাতা এবং স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউট দীর্ঘদিন ধরে যে PATANOMICS (পাতানমিক্স)-এর ধারণার কথা বলে আসছে;অর্থাৎ সিনকোনা, শেলাক, কেন্দুপাতা, পানপাতা ও শালপাতার মতো বনজ ও স্থানীয় সম্পদকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ--- এই বাজেটের ওডিওপি কর্মসূচির সঙ্গে তার একটি স্বাভাবিক সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যতে এই দুই ভাবনার সমন্বয় ঘটানো গেলে পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলার জন্য কর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র শিল্পের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে।

বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রেও বাজেটে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শিল্পে ইন্সেন্টিভ, নতুন স্টার্ট-আপ নীতি, পেশাগত করের ছাড় এবং আর্বান ল্যান্ড সিলিং আইন পুনর্বিবেচনার মতো সিদ্ধান্ত ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়। শিল্পপতিরা দীর্ঘদিন ধরে নীতিগত স্থিতিশীলতা ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার দাবি জানিয়ে এসেছেন। এখন দেখার বিষয়, এই ঘোষণাগুলি কত দ্রুত বাস্তব রূপ পায় এবং নতুন বিনিয়োগকে কতটা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

তবে আশার পাশাপাশি কিছু বাস্তব প্রশ্নও থেকে যায়। পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদনশীল শিল্পের অংশ এখনও জাতীয় গড়ের নীচে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগও প্রত্যাশার তুলনায় কম। ফলে বাজেটে ঘোষিত প্রকল্পগুলি যদি দ্রুত বাস্তবায়িত না হয়, তবে উন্নয়নের প্রত্যাশিত গতি অর্জন কঠিন হতে পারে।

উন্নয়নের প্রকৃত সাফল্য ঘোষণায় নয়, বাস্তবায়নে— অর্থনীতির এই চিরন্তন সত্য এখানেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

সব মিলিয়ে ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, কলকাতা-র মূল্যায়নে পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬-২৭ সালের বাজেট রাজ্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমুখী অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলা এবং উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল ও সুন্দরবনের মতো দীর্ঘদিন অবহেলিত অঞ্চলকে উন্নয়নের মূলস্রোতে আনার আন্তরিক প্রচেষ্টা এই বাজেটকে স্বতন্ত্র করেছে। তবে একই সঙ্গে এটিও মনে রাখতে হবে, ঘোষিত কর্মসূচির স্থায়ী সাফল্য নির্ভর করবে তিনটি বিষয়ের ওপর— কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতার ধারাবাহিকতা, আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পগুলির কার্যকরী বাস্তবায়ন।

পশ্চিমবঙ্গ বহুদিন ধরেই নতুন অর্থনৈতিক দিশার সন্ধান করছে। এই বাজেট সেই দিশা দেখানোর একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা। এখন সময়ই বলবে, এই পদক্ষেপ সত্যিই কি 'উন্নত পশ্চিমবঙ্গ' গড়ার দৃঢ় ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে, নাকি তা কেবল উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ইতিহাস শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতিকে নয়, বাস্তব ফলাফলকেই স্মরণে রাখে।

(লেখক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং প্রধান গবেষক ও প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, কলকাতা)

হালাল অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী হারাম অর্থনীতির সুযোগ করে দিচ্ছে

হালাল শিল্প হলো ইসলামিক সমান্তরাল সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ও যুদ্ধনীতি। যদি মুসলমানরা নিজেদের ইকোসিস্টেমে নিজেদের সমাজে সুখে বাঁচে, কারও আপত্তি নেই। মুসলমানরা প্রবাসে যেখানেই যায়, হালাল ইকোসিস্টেম গড়ে তোলে। তাই ইমিগ্র্যান্ট মুসলমানদের দিয়ে কোনো দেশের ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকার হয় না। কোনো ইসলামি দেশে সংখ্যালঘুদের কোনো সুযোগ নেই ব্যবসা করার, কারণ মুসলমানরা হারাম প্রোডাক্ট বর্জন করে।

পশ্চিমে দেখা যায়, এরা সরকারি সাহায্যে বাঁচবে, বিনা ট্যাক্সে দিনে ১০-১৪ ঘণ্টা কাজ করবে, নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের কম বেতনে নিয়োগ করবে, যাতে তারা সরকারি সাহায্যও পায়। এরা নিজেদের হালাল প্রতিষ্ঠানে কোনো পরিষেবা পেলে হারাম পরিষেবা নেবে না। ট্যাক্স ফাঁকি এদের আরেকটি বড়ো শিল্প। কোনো হারাম প্রতিষ্ঠানে একজন মুসলমান কাজ পেলে লক্ষ্য থাকে, অমুসলমানদের হালাল দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার। এরা নিজেদের হালাল প্রতিষ্ঠানেই ব্যাংকিং পরিষেবা নেয়। হালাল মিডিয়া ফেক মিডিয়াসেক্টরও বিশ্বে খুব উন্নত।

বিদেশে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই এরা পাশাপাশি থাকে, যাতে সেই অঞ্চলের রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একেকটি সেক্টরের ব্যবসা নিজেরা শুরু করে, শেষে সেই সেক্টর নিয়ন্ত্রণ করে; যেমন--- রেস্তোরাঁ, ড্রাগস ইত্যাদি। আজকাল এরা পরিকল্পনা করে সব ব্যবসাই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিচ্ছে।

কেনাকাটার সময় এরা নিজেদের হালাল দোকান থেকেই কিনবে, যাতে এদের টাকা এদের মধ্যেই থাকে। যদিও হালাল দোকানের পণ্যের গুণগত মান খারাপ এবং মূল্য বেশি। কিন্তু হালাল-প্রেমের কারণে এরা হারাম দোকান থেকে কেনে না। তুর্কি দোকানের কোল্ড স্টোরেজের বেগুন কেজিপ্রতি ৩-৪ ইউরো, হারাম দোকানে টাটকা বেগুন ২-২.৫০ ইউরো কেজি, আর বাংলাদেশি দোকানে ৬ ইউরো।

তারেক ভাই ঠিক বলেছেন, হালাল ব্যবসার ভবিষ্যৎ আছে। হারামিরা সেটা বুঝতে পারছে এবং তারা সমাজকে হালালমুক্ত করতে চাইতে পারে।

—**মৃণাল মজুমদার,**
বার্লিন, জার্মানি।

হেস্টিংস নাম পরিবর্তন করে মহারাজ নন্দকুমার রাখা হোক

আজকাল পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর অতীতের কিছু রাস্তার নামের সঙ্গে ঐতিহাসিক যে মালিন্য জড়িয়ে তাকে কাটিয়ে উঠে নতুন রাজ্যের মঙ্গলার্থে নিয়োজিত হারানো মানুষদের নামকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সদর্থক প্রচেষ্টা। এই প্রসঙ্গে জানাই দ্বিতীয় হুগলী সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতুটি ৩১ বছর আগে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বাসযাত্রী হিসেবে লক্ষ্য করে আসছি সেতুটি পেরোনোর পর বাসের প্রথম স্টপেজ Hastings যা ঘোড়দৌড়ের মাঠের সন্নিকটে। হাওড়াবাসী হিসেবে দেখেছি নিত্য লক্ষাধিক লোকের মুখে মুখে এই Hastings অযাচিত অমরত্ব পেয়ে যাচ্ছে। এখানে বলা দরকার, আমাদের বহুশ্রুত মহারাজ নন্দকুমারের নাম। ইনি ১৭০৫ সালে বীরভূম জেলার ভদ্রপুরে চট্টোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছোটোবেলা থেকেই তাঁকে কোর্ট, কাছারি প্রশাসন ইত্যাদি কাজে যথাযোগ্য প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। কালক্রমে আজকের মতো সরকারি ছাপ্পা দেওয়া আধিকারিক না হলেও তিনি একজন দক্ষ আমলা হয়ে ওঠেন। ইতিহাসের মহাসন্ধিক্ষণে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন হুগলীর ফৌজদার এবং পরে কলকাতার রক্ষণাবেক্ষণের সর্বোচ্চ পদাসীন। তিনি শহরের দক্ষিণে তৎকালীন আলিগড় অঞ্চলে শত্রুর আঘাত প্রতিহত করতে একটি দুর্গও নির্মাণ করেন। ইংরেজের কলকাতা আক্রমণে নবাবের পরাজিত সৈন্যরা এখানে ফিরে আসে। কিন্তু তৎকালীন প্রচলিত চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা জড়িত ছিল। নবাব পরিণামে নন্দকুমারকে পদচ্যুত করেন। অথচ ক্ষমতার অলিন্দে থাকায় তিনি অনায়াসেই ক্লাইভের পক্ষ নিতে পারতেন। সে অন্য প্রসঙ্গ।

পরবর্তীকালে তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার কারণে ইংরেজরা তাঁকে রাজকর্মচারী নিযুক্ত করে। অথচ এক যথার্থ নিরপেক্ষ আমলার গুণে তিনি মিরজাফর যাতে ইংরেজের ক্রীড়নক না হয়ে থাকেন সে কারণে দিল্লি বাদশার অনুমোদিত সনদ আনতে দ্বিধা করেননি। এটি বিদেশি প্রভুর বিরুদ্ধে তাঁর দেশপ্রেমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৭৬৫ সালে মীরজাফরের মৃত্যুর পর খবর রটে গেল নন্দকুমার ইংরেজ হটাবার ষড়যন্ত্র করছেন। তাঁকে বন্দি করে কলকাতায় আনা হলো। ততদিনে বঙ্গের ভার নিয়েছেন ইংল্যান্ডে ৫০ টাকা মাইনের অকিঞ্চিৎকর Waren Hastings। তাঁর হাতে পড়ল নন্দকুমারের বিচারের ভার। এখানে সে সময়কার বহু ইতিহাস আছে। মুঘল, ইংরেজ কেউই সত্যনিষ্ঠ নন্দকুমারকে সহ্য করতে পারছিল না। বিচার প্রহসনে তাঁর ফাঁসি কার্যকর হলো ঠিক ওইখানে যেখানে আজ দু'বেলা বাস এসে দাঁড়ায় ও Hastings ধ্বনি শোনা যায়। বাস্তবে নন্দকুমার অভিযোগ করার দুঃসাহস দেখিয়ে Governor of the Presidency'র অসাধুতা ধরে দিয়েছিলেন। লন্ডনের হাউস অব কমনসে এই ফাঁসিকে 'Judicial Murder' বলেছিলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাগ্মী Edmond Bank। সওয়াল-জবাব চলেছিল ৯ দিন। কিন্তু তিনি একজন

ফঃ ৩

সৎ ভারতবাসী হিসেবে অভাবনীয় সাহস দেখিয়ে জীবন দিলেন তিনি হারিয়ে গেলেন অনায়াসে। নাম রয়ে গেল শঠ, অসৎ, অত্যাচারী Hastings-এর। এই কারণে নাম যদি পরিবর্তন করতেই হয় Hastings-কে অপসারণ করে মহারাজ নন্দকুমারের নাম রেখে তাঁর যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

—**সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
শিবপুর, হাওড়া।

গুন্ডাদমন আইন

প্রত্যাশা মতো 'গুন্ডা দমন আইন' বিধানসভায় বিপুল গরিষ্ঠতায় পাশ হলো। মুদ্রার যেমন দুই পিঠ আছে, তেমনি আইনেরও আছে। একটা ভালো দিক হলো রাজনৈতিক নেতা পোষিত গুন্ডা যারা এতদিন বেলাগাম রাজ করে এসেছে তাদের প্রতিহত করা যাবে। শাস্তির উদ্দেশ্য হলো সেই পুরনো প্রবাদ 'ঝিকে মেরে বউকে শেখানোর' মতো। আইনে শাস্তির লক্ষ্য হলো কৃত অন্যায়ের জন্য যারা অপরাধী তাদের শাস্তি প্রদান করা প্রশাসনের উদ্দেশ্য হলো সামাজিক অপরাধীদের মনে ভয় উৎপন্ন করা যাতে শাস্তির ভয়ে তারা অন্যায় করতে, অপরাধ করতে দুবার ভাববে। গত প্রায় অর্ধশতক অপরাধীদের মনে থেকে ভয় উড়ে গেছে। কোনো অপরাধীকে বাঁচাতে বা ছেড়ে দিতে থানাই যথেষ্ট ছিল এবং মন্ত্রী বা নেতাদের থানার ওসিকে একটা ফোন যথেষ্ট ছিল। আদালতে হাজির হবার আগেই থানা থেকে জামিনে মুক্তি এতদিন পেয়ে এসেছে দুষ্কৃতীরা। এমনকী আইনের রক্ষক হিসেবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কৃতকর্মের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। বেহালা থানায় গিয়ে হামলা করে দুষ্কৃতী ছাড়িয়ে আনার ঘটনা আজও ভোলেনি রাজ্যবাসী।

এইসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য এই আইন। এটা তো গেল ভালো দিক। কিন্তু এই আইনের উলটো দিক আছে। সরকার আইন বানালেও তার রূপায়ণের ভার ন্যস্ত থাকে থানা স্তরের পুলিশ কর্মীদের ওপর। অতীতে আমরা ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে দেখছি মিসা আইন। সেই আইনের মূল লক্ষ্য এইরকম মজুতদার, অসাধু ব্যবসায়ীদের টাইট দিতে। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পশ্চিমবঙ্গে এই আইনের ভয়াবহতা দেখেছি। সাধারণ থানার কনস্টেবল স্তরের পুলিশ কর্মীদের দাপট দেখেছি। সেখানে বিনা বিচারে মাসের পর মাস জেলে আটক থাকতে দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ঘরপোড়া গোরু, গুন্ডা দমন আইনের সিঁদুরে মেঘের ইঙ্গিত পেলে ভয় হয়। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস এতে কোনো ভদ্রলোকের ভয় নেই। নেহাত ছাপোষা ভদ্রলোকের কোনোকালেই ভয় ছিল না, এবারও থাকবে না। আরও একটা বিষয় হলো, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোনো দল বা রাজনৈতিক গোষ্ঠী চিরকাল ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। সেক্ষেত্রে এই গুন্ডা দমন আইনটির অপপ্রয়োগ হবে না তো? ভবিষ্যৎ সরকারের শাসক বর্তমান সরকারের কর্মীদের এই আইন প্রয়োগ করে গুন্ডা অপবাদ দিয়ে জেলে পুরে আজকের প্রতিশোধ তুলতে পারে। আমরা আজ এই নিয়ে আপাতত ব্যস্ত থাকি, ভবিষ্যতের ভাবনা পরে না হয় ভাবা যাবে।

—**তারক সাহা,**
হিন্দমোটর, হুগলী।

শ্যামাপ্রসাদ আমাদের স্মরণে মননে আছেন

ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামটা উচ্চারণ করলেই বাঙ্গালির বুকের ভেতর একটা আলাদা গর্ব জেগে ওঠে। তিনি শুধু একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না, ছিলেন শিক্ষক, আইনজীবী, সংস্কৃতির ধারক। আজও তিনি আমাদের স্মরণে-মননে আছেন, কারণ তাঁর আদর্শ, তাঁর ত্যাগ আর তাঁর দেশপ্রেম সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে যায়।

ড: শ্যামাপ্রসাদ প্রথমে প্রাদেশিক রাজনীতিতে আসেন। বঙ্গ বিভাগের জন্য তাঁর লড়াই ইতিহাস। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তাঁর কূটনৈতিক প্রচেষ্টাতেই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ থাকে। স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভায় তিনি ছিলেন শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী। শিল্পায়ন, শরণার্থী পুনর্বাসন— সব ক্ষেত্রেই তাঁর দূরদর্শিতা ছিল।

পরে নেহরুর নীতির সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ায় তিনি মন্ত্রিত্ব ছাড়েন। ১৯৫১ সালে গড়ে তোলেন ভারতীয় জনসঙ্ঘ। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল 'এক দেশ, এক নিশান, এক বিধান'। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার বিরোধিতা করে তিনি বলেছিলেন, ভারতের এক ইঞ্চি জমিও আলাদা আইনে চলতে পারে না।

১৯৫৩ সালে বিনা পারমিটে কাশ্মীরে প্রবেশ করার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীনগরের জেলে থাকাকালীন ২৩ জুন তাঁর মৃত্যু হয়। মাত্র ৫২ বছর বয়সে এই অকাল প্রয়াণ আজও প্রশ্নের জন্ম দেয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যু বৃথা যায়নি। তাঁর দেখানো পথ ধরেই পরবর্তীকালে অনেক আন্দোলন হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ আমাদের শেখান আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে। তিনি শেখান, শিক্ষা ছাড়া জাতি এগোয় না। তিনি শেখান, দেশের স্বার্থে আপোশ নয়। পশ্চিমবঙ্গ আজ যে সংস্কৃতি আর জাতীয়তাবোধের কথা বলে, তার শিকড়ে তাঁর চিন্তা আছে।

তাই ঝড়-ঝাপটায়, রাজনীতির ওঠা-পড়ায় আমরা যখন দিশা হারাই, তখন শ্যামাপ্রসাদের কথা মনে পড়ে। তিনি আমাদের বিবেক। তিনি আমাদের সাহস। শ্যামাপ্রসাদ শুধু ইতিহাসের পাতায় নেই। তিনি আমাদের প্রতিদিনের লড়াইয়ে, আমাদের কথায়, আমাদের স্বপ্নে আছেন। যতদিন পশ্চিমবঙ্গ থাকবে, যতদিন ভারত থাকবে, ততদিন শ্যামাপ্রসাদও আমাদের স্মরণে-মননে থাকবেন। ৬ জুলাই তাঁর জন্মদিনে ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। বাঙ্গলি আজ গর্বিত। ২০২৬ সালে ৬ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা দেশে সগৌরবে তাঁর জন্মদিন পালিত হয়েছে।

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারীকল্যাণমূলক উদ্যোগ

অরুণা রায়চৌধুরী

একটি রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন সেই রাজ্যের নারীরা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর, সামাজিকভাবে মর্যাদাসম্পন্ন, শিক্ষায় অগ্রগামী এবং নিরাপদ জীবনযাপনের সুযোগ পান। এই বিশ্বাসকে সামনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষমতায় আসার পর নারীকল্যাণকে প্রশাসনের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে। নির্বাচনের আগে দেওয়া একাধিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পাশাপাশি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটেও নারীদের জন্য একাধিক প্রকল্প, আর্থিক সহায়তা ও সামাজিক সুরক্ষামূলক কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন সরকারের মতে, নারীকল্যাণ শুধুমাত্র অনুদান বা ভাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আত্মমর্যাদা— এই সমস্ত দিককে একত্রিত করেই প্রকৃত নারী ক্ষমতায়ন সম্ভব।

নতুন সরকারের সবচেয়ে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হলো অন্নপূর্ণা যোজনা। নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যোগ্য মহিলাদের প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পের আওতায় এসেছেন এবং প্রথম পর্যায়েই এক কোটিরও বেশি উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে অর্থ পৌঁছে গিয়েছে।

প্রতিটি মহিলাকে পরিবারের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও সক্ষম করে তোলা। সংসারের দৈনন্দিন ব্যয়ে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান। গ্রামীণ অর্থনীতিতে নগদ প্রবাহ বৃদ্ধি। আত্মনির্ভরশীল নারী সমাজ গড়ে তোলা। সরকারের মতে, এটি কেবল একটি ভাতা নয়, বরং নারীর আর্থিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার একটি দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ।

২০২৬-২৭ সালের বাজেটে নারী ও শিশু উন্নয়ন দপ্তরের জন্য ৫২,৩০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র অন্নপূর্ণা যোজনার জন্যই ৩৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা রাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ নারীকল্যাণমূলক আর্থিক বরাদ্দ। সরকার জানিয়েছে, এই অর্থ শুধুমাত্র নগদ সহায়তার জন্য নয়; স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, নিরাপত্তা ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নেও ব্যয় করা হবে।

নারী শিক্ষার প্রসারে বাজেটে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি ও সরকার-পোষিত কলেজে ভর্তি হওয়া যোগ্য ছাত্রীরা ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাবেন। এই প্রকল্পের লক্ষ্য উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। অর্থাভাবে পড়াশোনা বন্ধ হওয়া রোধ। গ্রামীণ ও নিম্ন আয়ের পরিবারের মেয়েদের কলেজে যেতে উৎসাহিত করা, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা। একটি শিক্ষিত নারী শুধু নিজের জীবনই পরিবর্তন করেন না, একটি পুরো পরিবার ও আগামী প্রজন্মকেও আলোকিত করেন। এই দর্শন থেকেই এই প্রকল্পের সূচনা।

এছাড়া গর্ভবতী ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করতে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারের গর্ভবতী মহিলাদের জন্য ২১ হাজার টাকা পর্যন্ত মাতৃত্বকালীন সহায়তা ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ, প্রসব-পূর্ব স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ, গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারের মতে, সুস্থ মা মানেই সুস্থ ভবিষ্যৎ। মহিলাদের নিরাপত্তায় নতুন পদক্ষেপ, নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার একাধিক প্রশাসনিক সংস্কার শুরু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিটি থানায় Women's Help Desk, জরুরি ১১২ ডায়াল পরিষেবা আরও শক্তিশালী করা, দুর্গা স্কোয়াড গঠন, নারী নির্যাতনের অভিযোগে দ্রুত তদন্ত, সাইবার অপরাধে বিশেষ নজরদারি ও মহিলা পুলিশ কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি। এর উদ্দেশ্য হলো, কোনো মহিলা যাতে ভয় ছাড়াই আইনগত সহায়তা পেতে পারেন।

শুধু আর্থিক অনুদান নয়, নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকার ঘোষণা করেছে দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মহিলা উদ্যোক্তাদের সহায়তা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সহজ ঋণ, ডিজিটাল প্রশিক্ষণ, গ্রামীণ উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ-এর ফলে বহু মহিলা স্বনির্ভর হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন Self Help Group-এর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীদের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সরকার স্বল্প সুদে ঋণ, বিপণন সহায়তা, ডিজিটাল পেমেন্ট, ই-কমার্স সংযোগ, প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে মহিলা উদ্যোক্তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। নতুন সরকার জানিয়েছে, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে প্রকৃত উপভোক্তাদেরই সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে। সেই লক্ষ্যে ডিজিটাল যাচাই, আধার সংযুক্তীকরণ ডিবিটি ব্যবস্থা, জাল সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ-এর মাধ্যমে সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নবনির্বাচিত রাজ্য সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী নারী উন্নয়নকে শুধুমাত্র সামাজিক কল্যাণ প্রকল্প হিসেবে দেখা হবে না।

সরকারের নতুন ভাবনা হলো— ● নারীকে ভাতা নয়, মর্যাদা। ● সহায়তা নয়, আত্মনির্ভরতা। ● নিরাপত্তা নয়, নেতৃত্ব। ● অংশগ্রহণ নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান ভূমিকা। এই লক্ষ্য নিয়েই আগামী পাঁচ বছরে নারীকল্যাণের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

প্রসবোত্তর বিষণ্ণতা ও কিছু কথা

ডাঃ বলরাম পাল

সাধারণত সন্তান প্রসবের পর বিশেষ করে প্রথম সন্তান প্রসবের পর মায়েদের মধ্যে এক ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়কে Postpartum Depression বা প্রসবোত্তর বিষণ্ণতা বলা হয়। গর্ভাবস্থায় ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন হরমোনের মাত্রা প্রায় দশগুণ বেড়ে যায়, আবার প্রসবের দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে এই হরমোনগুলোর মাত্রা গর্ভাবস্থার পূর্ববর্তী পর্যায়ে ফিরে আসে। হরমোনের এই ওঠা নামার কারণে অনেক সময় মায়েদের Postpartum Depression বা প্রসবোত্তর বিষণ্ণতা দেখা যায়।

এই সময়ের বিষণ্ণতাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় যেমন বেবি ব্লুজ, প্রসব পরবর্তী বিষণ্ণতা এবং প্রসবোত্তর সাইকোসিস।

বেবি ব্লুজ-এর লক্ষণাবলী :

● হঠাৎ মন খারাপ হওয়া বা অকারণে কান্না পাওয়া।

● ঘুমের সমস্যার সঙ্গে নানা ধরনের উদ্বেগ।

● মা মনে করে সে যেন নিজের বা সন্তানের যত্ন ঠিকমতো নিতে পারবে না এবং এর থেকে তার মনে একটা ভয় বা সংশয় কাজ করে।

● নতুন শিশুর জন্মের পর অপর্যাপ্ত ঘুম এবং ধকলের কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে পর্যাপ্ত বিশ্রাম, সুষম খাবার খাওয়া এবং পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সহযোগিতায় লক্ষণগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই চলে যায়।

প্রসবোত্তর বিষণ্ণতা :

যদি উল্লেখিত লক্ষণগুলি দুই সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়ে তীব্র আকার ধারণ করে তখন তাকে প্রসবোত্তর বিষণ্ণতা বলা হয়।

প্রসবোত্তর সাইকোসিস :

এই পর্যায়টি খুবই গুরুতর তবে বিরল। প্রতি ১ হাজার জনের মধ্যে ১ জনকে আক্রান্ত করে। এর লক্ষণগুলি সাধারণত দ্রুত এবং তীব্রভাবে দেখা দেয় এবং সপ্তাহ বা মাস ধরে স্থায়ী হয়।

লক্ষণ বা উপসর্গ সমূহ :

● রোগী নিজে নিজে খুব দুঃখ অনুভব করে এবং সে মনে মনে ভাবে সংসারে তার যেন কোনো মূল্য নেই। তার মধ্যে একটা হতাশা এবং অপরাধবোধ কাজ করতে থাকে।

● অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করে অস্থিরতা বোধ করে।

● সাধারণ উপভোগ্য জিনিসের প্রতি তার আগ্রহ কমে যায়।

● ক্ষুধা মন্দা বা খাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে, ফলে শক্তি ও প্রেরণার ঘাটতি দেখা যায়।

● ঘুমের সমস্যা হয় অথবা সারাক্ষণ ঘুমাতে চায়।

● কারণে অকারণে কান্নাকাটি করে।

● আপন শিশুর প্রতি আগ্রহের অভাব অথবা শিশুর আশেপাশে থাকলে সে উদ্বিগ্ন বোধ করে।

● অনেক সময় নিজের শিশুর ক্ষতি করার চিন্তা বা আত্মহননের চিন্তা করতে থাকে।

মনে রাখতে হবে প্রসবোত্তর বিষণ্ণতা বা প্রসবোত্তর সাইকোসিস যাই হোক না কেন এক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র, দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে নারদ জয়ন্তী উদ্‌যাপন ও সাংবাদিক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র, দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে গত ৫ জুলাই কলকাতার শিশির মঞ্চে আয়োজন করা হয় আদি সাংবাদিক 'নারদ জয়ন্তী উদ্‌যাপন এবং সাংবাদিক সম্মাননা প্রদান' অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিক্স; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি; খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন মন্ত্রী ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী, ইংরেজি সাপ্তাহিক অর্গানাইজার পত্রিকার সম্পাদক প্রফুল্ল কেতকর, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ জিষ্ণু বসু এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়। বেদমন্ত্র উচ্চারণ ও নারদস্তুতির পর আদি সাংবাদিক দেবর্ষি নারদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর স্বাগত ভাষণ রাখেন বিপ্লব রায়। এরপর নবীন প্রজন্মের ১১ জন নির্ভীক ও দেশভক্ত সাংবাদিক — পিনাকপাণি ঘোষ, সাহানা মুখোপাধ্যায়, শুভ ব্যানার্জি, অদ্বিতীয়া রায়, সফিকুল ইসলাম, অনির্বাণ সিনহা, সন্তোষ মধুপ, স্বর্ণালী রায়, সন্তু পান, প্রবীর ভট্টাচার্য ও রক্তিম দাসকে তাঁদের বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য সম্মাননা প্রদান করে তাঁদের হাতে দেবর্ষি নারদের প্রতিকৃতি তুলে দেন ডঃ জিষ্ণু বসু, প্রফুল্ল কেতকর, ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী এবং বিপ্লব রায়। এরপর গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা এবং নির্ভীক সাংবাদিকতার কথা উল্লেখ করে ডঃ জিষ্ণু বসু তাঁর ভাষণে বলেন, সংবাদজগতে যাঁরা মাথা উঁচু করে লড়াই করেন এই বঙ্গভূমি কখনো তাঁদের ভুলে যায় না।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। তিনি প্রদীপ প্রজ্বলন এবং দেবর্ষি নারদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করার পর বন্দে মাতরম ও জনগণমন জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। তাঁকে বরণ করেন মঞ্চাসীন অতিথিগণ। এরপর রাজ্যপাল মহোদয় প্রবীণ বিশিষ্ট সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ রায়, ডঃ বিজয় আঢ্য, ভজনলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং নোয়াখালি হিন্দু গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী তথা লেখক রবীন্দ্রনাথ দত্তকে উত্তরীয় পরিয়ে এবং স্মারক প্রদান করে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা প্রফুল্ল কেতকর তাঁর ভাষণে সংবাদপত্রের নানা দিক এবং তার সামাজিক দায়িত্বের কথা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর ভাষণে বলেন, দীর্ঘদিন অন্ধকারে থাকার পর পশ্চিমবঙ্গে আবার নতুন সূর্যোদয় ঘটেছে। দেশভক্ত মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই এটা সম্ভব হয়েছে। আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি যতটা হবে, সারা দেশের অগ্রগতিও সেভাবেই হবে। একদা পিছিয়ে থাকা ভারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বর্তমানে কীভাবে বিশ্বমঞ্চে শীর্ষস্থান দখল করেছে, তিনি তার এক-একটি উদাহরণ তুলে ধরেন।

সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডঃ দেবাশিস আইয়ার এবং তিলক সেনগুপ্ত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অরিন্দম রায়। শেষলগ্নে আবার একবার বন্দে মাতরম্ এবং জনগণমন জাতীয় সঙ্গীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

Today's Choice.....
Vandana®
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

কলকাতা রবীন্দ্র সদনে এনএমও-র বর্ণাঢ্য সম্মেলন

জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষ্যে গত ১ জুলাই কলকাতার রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন (এনএমও), দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ এবং সরকারির ও বেসরকারির হাসপাতাল থেকে ১৪৫০ জন চিকিৎসক, ইন্টার্ন ও ডাক্তারি পড়ুয়া অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খান, বিধায়ক ডাঃ বিজন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অরূপ কুমার দাস, ও ডাঃ প্রণত টুডু। এছাড়াও ছিলেন পদ্মশ্রী ডাঃ অরুণোদয় মণ্ডল, পদ্মশ্রী ডাঃ সরোজ মণ্ডল, এনএমও-র অন্যতম কার্যকর্তা ডাঃ কুণাল কিশোর গুপ্তা এবং ডাঃ অমিত কুমার বেরা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন মাতৃভবনের সহ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা ডাঃ আলোকপ্রাণা মাতাজী,রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ জিষ্ণু বসু-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, 'রোগী হিতম্ সর্বোপরি' এবং 'ভিষক-রোগী একং কুটুম্বকম্'। অর্থাৎ রোগীর সর্বোচ্চ কল্যাণকে চিকিৎসা পরিষেবার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখার পাশাপাশি চিকিৎসক ও রোগী একই পরিবারের অংশ— এই মানবিক ভাবনাকে সমাজে আরও বিস্তৃত করা।

ভগবান ধন্বন্তরী ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পর সম্মেলনের সূচনা হয়। এরপর চিকিৎসা বিজ্ঞান, চিকিৎসা-নৈতিকতা আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষা, পেশাগত পরিকল্পনা এবং সমাজসেবায় চিকিৎকদের ভূমিকা নিয়ে একাধিক আলোচনা হয়। বক্তারা চিকিৎসা পেশায় মানবিকতা, নৈতিকতা এবং আত্মনিবেদিত সেবার গুরুত্ব তুলে ধরেন। ডাঃ অরুণোদয় মণ্ডল ও ডাঃ সরোজ মণ্ডল তরুণ চিকিৎসকদের রোগীকেন্দ্রিক চিকিৎসা, পেশাগত সততা এবং উৎকর্ষের লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান। প্রব্রাজিকা আলোকপ্রাণা মাতাজী স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানব সেবাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার বার্তা দেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসবেক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল চিকিৎসকদের জাতিগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, সেবাভাব এবং নৈতিক মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করার আহ্বান জানান। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট ভারতীয় দর্শন ও চিকিৎশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করেন।

এদিন উপস্থিত বিশিষ্ট চিকিৎসকরা তাঁদের দীর্ঘ পেশাগত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি স্নাতকোত্তর প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি, আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি, গবেষণা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক নিয়ে ডাক্তারি পড়ুয়াদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। শেষপর্বে বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ-সহ ডাক্তারি ছাত্র-ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সম্মেলনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলেন। দিনব্যাপী এই সম্মেলনে এনএমও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের অধ্যক্ষ ডাঃ রুদ্রনীল নন্দী আদর্শ চিকিৎসকের গুণাবলীর বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের সচিব ডাঃ অর্ণব পাল এনএমও-র লক্ষ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন। পূর্বক্ষেত্রের সচিব ডাঃ প্রভাত কুমার সিংহ পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন।

সম্মেলনে উপস্থিত চিকিৎসক ও ডাক্তারি ছাত্র-ছাত্রীরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন, মানবসেবায় আত্মনিয়োগ এবং জাতির কল্যাণে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

সংস্কার ভারতী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখার পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন

গত ২০ জুন সংস্কার ভারতী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখার উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলার সমস্ত আধিকারিক, বিধায়ক, মন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খান-সহ বহু বিশিষ্ট নাগরিক। উদ্বোধন ও প্রারম্ভিক ভাষণ পর্বের পর প্রথম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল সংস্কার ভারতীর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখার সঙ্গীত নৃত্যালেখ্য **শ্যামাপ্রসাদ— এক সঙ্কট সময়ের দিশারি**। সঙ্কলনা— রীণা ব্যানার্জী। মঞ্চে পরিবেশিত সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য ও আলেখ্য সহযোগে নৃত্য-কোরিওগ্রাফি সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে একটি আলাদা মর্যাদা দেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত উচ্চ অধিকারীগণ অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন পাপিয়া ভট্টাচার্য, নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন ওড়িশি নৃত্যগুরু মোনালিসা ঘোষ, কথক নৃত্যগুরু কুশল ভট্টাচার্য এবং ভরতনাট্যম নৃত্যগুরু প্রফেসর দেবযানী চট্টোপাধ্যায়। ভাষ্যপাঠে ছিলেন লিপিকা চৌধুরী ও শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে মোনালিসা ঘোষ মহাশয়ার কলাজ্যোতি গুরুকুল ওড়িশি নৃত্য মোক্ষ পরিবেশন করে। জাতীয় সঙ্গীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

হাওড়ায় ঋষি বঙ্কিম মেলা ও বন্দে মাতরম্ উৎসব

ঋষি বঙ্কিম মেলা ও বন্দে মাতরম্ উৎসব সমিতির পরিচালনায় গত ২০ থেকে ২৮ জুন ন'দিন ধরে 'বঙ্কিম মেলা ও বন্দে মাতরম্ উৎসব' অনুষ্ঠিত হলো বন্দে মাতরমের উদ্‌গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পদধূলিধন্য এবং তাঁরই নামাঙ্কিত হাওড়ার বঙ্কিম পার্কে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের রাজ্য সম্পাদক স্বামী পুরুযোত্তমানন্দজী মহারাজ, সমিতির সভাপতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবেশ সংরক্ষক সুভাষ দত্ত, সহ সভাপতি ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে, সমিতির সাংস্কৃতিক সম্পাদক শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। মেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিদিন সঙ্গীত, নৃত্য, নৃত্যনাট্য, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক পরিবেশিত হয়।

পতঞ্জলি যোগপীঠের পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি মহামায়া রায়, মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদানের বিষয়ে কল্যাণ পাত্র, হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি আইনজীবী শান্তনু সিংহ, বিশিষ্ট পর্বতশৃঙ্গ জয়ী দেবাশিস বিশ্বাস, রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমের সম্পাদক শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ মহারাজ প্রমুখ বক্তব্য, ভাষণ, আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পরিবেশিত হয় যোগানুশীলন ও ম্যাজিক শো। ছিল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে নানান আলোচনা এবং অনেক না জানা তথ্য।

শান্তিনিকেতনের সৃজনী শিল্পগ্রামে সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৭-২৮ জুন বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনের সৃজনী শিল্পগ্রামে অনুষ্ঠিত হলো সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা। মঞ্চাসীন ছিলেন সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, অখিল ভারতীয় মাতৃশক্তি সহ সংযোজিকা মিথিলেশ তেওয়ারি, সংস্থার পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্রপ্রমুখ অধীর রায়, প্রান্ত

কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ গোপাল কুণ্ডু, সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস গিরি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখ বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়।

দুপুর ৩টায় উপস্থিত অতিথিদের দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে সভার শুভারম্ভ হয়। এরপর সংস্থার ভাবসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। তারপর শ্রীমুখোপাধ্যায় সঙ্ঘ ও সংস্কার ভারতীর বৈচারিক দিশা সম্পর্কে বলেন, সঙ্ঘের বিবিধ ক্ষেত্রের মধ্যে সংস্কার ভারতী সারা দেশে সাহিত্য, কলাবিভাগে একটি বৃহৎ সংগঠন হিসেবে কলা সাধনার মাধমে মানবতাবোধ ও রাষ্ট্রভাব জাগরণের কর্তব্য পালন করে চলেছে। ভারতীয় মার্গসঙ্গীত শুধুমাত্র স্বরের কম্পন, লয় বা স্বরের বিন্যাস নয়— সবই মনুষ্যত্ব নির্মাণের পথ। ভারতীয় কলা, রাগ-রাগিণী মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তোলার প্রয়োগশালা। তাই সংস্কার ভারতী যত বেশি মানুষকে সংগঠনে যুক্ত করে কলা সাধনার মাধ্যমে শিল্পীসত্তার উত্তরণ ঘটাতে পারবে, তত বেশি সমাজকে সুন্দর করে তুলতে পারবে।

এরপরে সহ সাধারণ সম্পাদক অমিত দে বিগত বছরের ৩৮তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এরপর সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন এবং বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করেন প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ গোপাল কুণ্ডু। দুটিই সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। আগামী বছরের জন্য অডিটর হিসেবে S. Rastogi & Associates-কে সর্বসম্মতি ক্রমে নিয়োগ করা হয়। এরপর সাধারণ সম্পাদক আগামী ২০২৬-২৭ বর্ষের কার্যকরী সমিতির নাম ঘোষণা করেন। সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়— (১) বঙ্গাব্দের প্রবর্তক মহারাজা শশাঙ্কের মূর্তি প্রতিষ্ঠা, (২) রাজনীতিমুক্ত টলিউড এবং সুস্থ চলচ্চিত্র গঠন, (৩) পশ্চিমবঙ্গের মন্দির সংরক্ষণে হেরিটেজ কমিশনের কার্যকর ভূমিকা, (৪) রাজ্যের লোকসংস্কৃতির পুনর্জাগরণে পৃথক লোকসংস্কৃতি অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা, (৫) বঙ্গীয় কীর্তনের ধ্রুপদী স্বীকৃতির জন্য উদ্যোগ এবং (৬) বঙ্গের প্রাচীন নৃত্যধারা গৌড়ীয় নৃত্যের শাস্ত্রীয় স্বীকৃতির দাবি।

পরবর্তী সত্রে, অখিল ভারতীয় মাতৃশক্তি সহ-সংযোজিকা মিথিলেশ তেওয়ারি মহোদয়া সংস্কার ভারতীয় মহিলা কার্যকর্তার স্বরূপ কেমন হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সান্ধ্যসত্রে ছিল, নর্তেশ্বর নৃত্য উৎসব। বঙ্গ সংস্কৃতির আদি পুরুষ নর্তেশ্বর প্রসঙ্গে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস গিরি সুন্দর ও প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন। এরপর চারটি নৃত্যধারার নৃত্য যেমন, গৌড়ীয় নৃত্য, মণিপুরী নৃত্য, ভরতনাট্যম্ এবং রবীন্দ্র নৃত্য

পরিবেশন করেন চারটি জেলার শিল্পীরা। এরমধ্যে জেলার প্রতিনিধিরা নিজ নিজ জেলার বৃত্ত নিবেদন করেন এবং কলাবিভাগ ও সাহিত্য কলা বিভাগ PPT Presentation-এর মাধ্যমে দুটি বিভাগে সারা বছরের কাজের বিবরণী পেশ করেন। এরপরে শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় এবং সুভাষ ভট্টাচার্য সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিন প্রভাতি সত্রে বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংস্কার ভারতীর আশু কর্তব্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং সংগঠনে ব্যক্তি চয়নের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করার বার্তা দেন। তারই সঙ্গে কার্যকর্তাদের নিজ নিজ মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ ও বিচার ক্ষমতা বাড়ানোর পরামর্শ দেন।

সমাপন সত্রে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি ডঃ সরূপপ্রসাদ ঘোষ, বিধায়ক তথা কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল, সঙ্ঘের বীরভূম বিভাগ কার্যবাহ অনিমেষ মুখোপাধ্যায় এবং সংস্থার অন্যান্য পদাধিকারীগণ। বিধায়ক শ্রীমণ্ডলকে সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

সমাপ্তি ভাষণে ডঃ ঘোষ সকলকে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করে সংগঠনের কাজ করার আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে তিনি হিন্দুত্ব বোঝার জন্য হুগলীর চন্দ্রনাথ বসুর 'হিন্দুত্ব' বইটি পড়ার কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গ গঠনের সংগ্রামকে যেমন আমাদের সামনে তুলে ধরতে হবে তেমনই শ্রীগুরুজী, ডাক্তারজী, স্বামী প্রণবানন্দের আদর্শের কথাও সবার সামনে তুলে ধরা দরকার। তার জন্য সংগঠনের বিস্তার দরকার।

বালিগঞ্জে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দজী ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিষয়ক আলোচনাসভা

গত ৪ জুলাই 'রাসবিহারী অ্যাভিনিউ বিবেকানন্দ সেন্টার ফর সোশ্যাল সার্ভিস' ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ধৃ'-এর যৌথ উদ্যোগে দক্ষিণ কলকাতায় বালিগঞ্জ-স্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শ্রীনাথ রায় সভাগৃহে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে 'অখণ্ড ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব' ও 'এক দেশ, এক বিধান, এক নিশান'-শীর্ষক

একটি আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং বীরসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ ও ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। মঞ্চে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ। এদিনের আলোচনাসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দজী মহারাজ, অধ্যাপক ড. পুলকনারায়ণ ধর, বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রবীর ভট্টাচার্য্য, বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ পার্থ বসু ও বিশিষ্ট আইনজীবী রণজয় বিশ্বাস। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে উপরোক্ত বিষয়দ্বয় যথার্থভাবে উপস্থাপন করেন। স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের বাণী উদ্ধৃত করে স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ বলেন যে, এই যুগ মহাজাগরণের যুগ, মহাসমন্বয়ের যুগ, মহামিলনের যুগ, মহামুক্তির যুগ। এই সময় বরেণ্য মহাপুরুষদের বাণী ও আদর্শকে পাথেয় করে ভারতকে সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে হবে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা শ্রীমতী শর্বরী মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের আয়োজকদের পক্ষ থেকে সমাজে প্রান্তস্থ ক্ষেত্রে জনসেবামূলক কাজে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। উত্তরীয় পরিয়ে, পুষ্পস্তবকের মাধ্যমে তাঁদের সংবর্ধনা প্রদান করেন বিধায়িকা শর্বরী মুখোপাধ্যায়। বক্তাদের বক্তব্যের পর এদিনের সভার আয়োজক সংস্থা 'ধৃ'-এর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন প্রত্নতত্ত্ববিদ পার্থ বসু। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শুভাশিস ভদ্র চৌধুরী। জাতীয়তাবাদী মানুষের সমাগমে এদিনের সভাগৃহ ছিল পরিপূর্ণ। সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্', 'জনগণমন অধিনায়ক' ও জয়ধ্বনির মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

‘নয়াবাদ তিতাস’-এর ১৪ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে থিয়েটার, ভাবনা ও উদ্‌যাপনের এক সন্ধ্যা

রাজ্যে খুব শীঘ্রই ‘জাতীয় নাট্য উৎসব’ হবে বলে জানিয়েছেন ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা-র অধিকর্তা চিত্তরঞ্জন ত্রিপাঠী। গত ১৮ জুন রবীন্দ্র সদনে ‘থিয়েটারের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি কী ভাবেন?’-শীর্ষক এক আলোচনাসভায় তিনি জানান যে, শীঘ্রই ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা-র তত্ত্বাবধানে একটি নাট্য কর্মশালা এবং তিনমাসের নাট্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে। যুগে যুগে নাট্যশিল্পে বাঙ্গলার অবদানকে তুলে ধরে তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গকে ছাড়া আধুনিক নাট্যশিল্পকে ভাবাই যায় না।

আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংস্কার ভারতী-র কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায় বলেন— বর্তমান ভারতে রাষ্ট্রবাদী নাটকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নাটক খুব সহজেই মানুষের মনকে স্পর্শ করে এবং তা যে কোনো জাতির আত্মমর্যাদাকে প্রকাশের একটি মাধ্যম বলেও তিনি মন্তব্য করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন। আধুনিক সময়ে যাঁরা নাটক মঞ্চস্থ করবেন, সেখানে নাটকের বিষয়, ভাবনা, সংযত ভাষা ব্যবহারের প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

‘নয়াবাদ তিতাস’ নাট্য সংগঠনের ১৪ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে নাট্যশিল্পী ও বিধায়িকা শর্বরী মুখোপাধ্যায় ও ‘নয়াবাদ তিতাস’ নাট্যদলের পরিচালক আবির বিশিষ্ট অতিথিদের মঞ্চে অভ্যর্থনা জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও বিধায়িকা পাপিয়া অধিকারী, প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক ও বিধায়ক দেবাশিস ধর প্রমুখ বিশিষ্টজন। ‘নয়াবাদ তিতাস’ নাট্যদলের সভাপতি অভিজিৎ রায় তাঁর বক্তব্যে পাশাপাশি দুই এলাকা— টালিগঞ্জ ও যাদবপুরে দুই বিশিষ্ট অভিনেত্রীর নির্বাচনে জয়লাভ মানুষের নাটকের প্রতি ভালোবাসার পরিচয় বলে উল্লেখ করেন। দর্শকদের অনুরোধে রুদ্রনীল ঘোষ স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। আলোচনাসভার শেষে ‘নয়াবাদ তিতাস’ প্রযোজিত, আবির নির্দেশিত ‘অপাঙ্‌ক্তেয়’ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিপক্ষ উদ্‌যাপন

গত ৪ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশনায় নদীয়া জেলার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিজে আবদুল কালাম সভাগৃহে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিপক্ষ উদ্‌যাপিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বেলডাঙ্গা শাখার অধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ। খড়দহ দুর্গাধামের সন্ন্যাসী শ্রীসঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্ট অনুষদের অধ্যক্ষ ডঃ পার্থপ্রতিম সরকার, বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যক্ষ ডঃ কুমারেশ ঘোষ, রেজিস্ট্রার ডঃ দেবাংশু রায়, অর্থ আধিকারিক মৃদুল কুণ্ডু এবং দূরশিক্ষা অধিকর্তা ডঃ আশিস পাণিগ্রাহী। বহু বিদগ্ধজনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ডঃ সুশান্ত মজুমদার। ভরত কুণ্ডুর কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশনের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

শিলিগুড়ি সারদা শিশুতীর্থে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ির সূর্যসেন কলোনীর সারদা শিশুতীর্থে অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। শিশুদের দ্বারা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কিছু কথা, বাণীপাঠ ও দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অন্যদিকে, প্রথম বিভাগের ভাই-বোনেরা দেশাত্মবোধক গান, কবিতা ও নৃত্যের আয়োজন করে। এছাড়া বাণীপাঠ, কুইজ এবং কিছু তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপরে সারদা শিশু তীর্থ, বিদ্যামন্দির পুঁটিমারী ও অলক মিতা সারদা শিশু তীর্থের আচার্য-আচার্যাদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ডঃ জয়দীপ ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ঘোষ ও বিমলকৃষ্ণ দাস। একজন তেজস্বী পিতার যোগ্য পুত্র হিসেবে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের অবদান, এক দেশ এক আইন-সহ বিভিন্ন সমসাময়িক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সারদা শিশু তীর্থ সূর্যসেন কলোনীর প্রধান আচার্য অনিরুদ্ধ দাস।

বন্দে মাতরম্ গানের পরে অনুষ্ঠানের অমাপ্তি ঘটে।

বেলেঘাটায় সনাতনীদের প্রতিবাদী পদযাত্রা

বাংলাদেশের রংপুর ডিভিশনের গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়িতে এশিয়ার সর্ববৃহৎ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছে হিন্দুসমাজ। সম্প্রতি জামাতি মোল্লাবাদীরা সেই মূর্তি নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। শ্রীভগবানের মূর্তি নির্মাণ বন্ধ করে দেওয়া এবং বিগত কয়েক মাস যাবৎ বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু হত্যা, জোরপূর্বক হিন্দুদের সম্পত্তি দখল এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হলো 'বেলেঘাটা নাগরিক সমাজ'। গত ২ জুলাই বেলেঘাটা নাগরিক সমাজের উদ্যোগে পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটায় সরকারবাজারে ভাটিখানা হতে সিআইটি বিল্ডিং পর্যন্ত একটি প্রতিবাদী

পদযাত্রা আয়োজিত হয়।

সাধুসন্তদের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পূজাপাঠের মাধ্যমে এদিনের কার্যক্রমের সূত্রপাত হয়। শঙ্খধ্বনি করেন সমবেত মাতৃশক্তি। এরপর পদযাত্রা শুরু হয়। ব্যানার সহযোগে পদযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন সাধুসন্তরা। আরেকটি ব্যানার-সহ পদযাত্রার মধ্যভাগে ছিলেন মাতৃমণ্ডলী। সমাজের অনেক বিশিষ্টজন ও মাতৃশক্তি-সহ প্রায় এক হাজারের অধিক সনাতনী এই প্রতিবাদী পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

রাস্তার দু'ধারে বহু মানুষ সমবেত হয়ে পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন। পদযাত্রা সমাপ্ত হলে স্থানীয়রা পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সনাতনীদের মধ্যে শরবত ও লাড্ডু বিতরণ করেন।

এন্টালিতে 'ভগবান নৃসিংহ বিশ্বশান্তি বার্তা যজ্ঞ'

গত ১৪ জুন মধ্য কলকাতায় এন্টালিতে মতিঝিল-স্থিত এন্টালি যুবক সঙ্ঘ ময়দানের নিকটে কাঠগোলা দুর্গামন্দিরে 'বৈচিত্র্য ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে আয়োজিত হয় ভগবান নৃসিংহদেব-এর বৈদিক যজ্ঞ, হরিনাম সংকীর্তন, আধ্যাত্মিক আলোচনা ও ভক্তিমূলক অর্ঘ্য নিবেদনের অনুষ্ঠান। যজ্ঞানুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিল— বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ, বউবাজার জেলা (এন্টালি)। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জুনা আখাড়ার পূজনীয় সন্ত জগদ্গুরু স্বামী পরমাত্মানন্দজী মহারাজ, দক্ষিণ কলকাতা-স্থিত মহানির্বাণ মঠের পূজনীয় সন্ত স্বামী সর্বানন্দজী মহারাজ, ইসকনের সন্ন্যাসী রাজেশ্বর প্রভু, নাথ সম্প্রদায়ের সাধক যোগী অরুণ নাথজী মহারাজ, বিশিষ্ট আইনজীবী ড. প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল, বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কার্যকর্তা বিপিন মণ্ডল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টজন। বৈদিক যজ্ঞের পর মঙ্গলাচরণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সনাতনীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন পূজনীয় সাধুসন্তমণ্ডলী। ভগবান নৃসিংহদেবের স্তবমন্ত্র পাঠ, শ্রীভগবানের মহিমা-বর্ণন করে আধুনিক পৃথিবীতে দুষ্টের দলন, শিষ্টের পালনের ওপর তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রিঙ্কু মজুমদার ও সাগর মজুমদার। বৈদিক যজ্ঞ, সংকীর্তন ও পূজনীয় সন্তদের প্রবচনের পর ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বণ্টন করা হয়।

TRUE LUXURY. NOW IN HOWRAH.

From the makers of The Ramdulari comes a landmark riverfront address.
For the first time, Howrah can experience truly exceptional living.

KNOW MORE

2.41 CR* ONWARDS | 3,4,5 BHK | FORESHORE ROAD

WBRERA/P/HOW/2025/003467 | rera.gov.in 98830 55000 primarcaadvika.com

PRIMARC
AADVIKA

অখণ্ড দিনাজপুর জেলার লোকসংস্কৃতির সোনার ফসল 'খন গান'

ড: দেবব্রত রায়

পশ্চিমবঙ্গের একটি অতি ক্ষুদ্র ও আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেরা জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। জেলার উত্তরদিকে উত্তর দিনাজপুর জেলা ও বাংলাদেশ এবং দক্ষিণে বাংলাদেশ ও মালদা জেলা।

মূলত কৃষিসম্পদকে কেন্দ্র করেই এই জেলার অর্থনীতি আবর্তিত হয়। কৃষিনির্ভর এই জেলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটিও অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও অহংকারযোগ্য। আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এই জেলার সংস্কৃতির মূল স্তম্ভই হলো লোকনাটক তথা লোকনাট্য। লোকনাটক ও পরিশীলিত নাটক উভয় প্রকার নাটকের চর্চাই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় রয়েছে। জেলার শহর ও গঞ্জগুলিতে মূলত পরিশীলিত নাটকের চর্চা হয় এবং গ্রামগুলিতে হয় লোকনাট্যের চর্চা। জেলা সদর বালুরঘাট যেমন নাটকের (পরিশীলিত) শহর হিসেবে খ্যাত, তেমনই এই জেলায় অধিকাংশ গ্রামই হলো লোকনাট্যের চর্চাকেন্দ্র। জেলার প্রত্যেকটি গ্রামেই কোনো না কোনো লোকনাটকের দল কিংবা শিল্পী রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের এই জেলাকে নিয়ে একটি বিশেষ প্রবাদ প্রচলিত আছে— 'চাল চিঁড়ে নাটক গুড়। এই চারে দিনাজপুর।' এই জেলার নাট্যসংস্কৃতি যে কত প্রগাঢ় তা এই প্রবাদেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

অখণ্ড দিনাজপুর জেলার লোকসংস্কৃতির সোনার ফসল 'খন' লোকআঙ্গিক। খণ্ডিত দিনাজপুর জেলার সামান্যতম ভূভাগ হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার লোকসংস্কৃতির আঙ্গিনাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল করে রেখেছে এই আঙ্গিকটি। গানের প্রাচুর্যের কারণে 'খন' লোকসমাজে 'খন গান' বা 'খন গাউন' নামে পরিচিত হলেও এটি মূলত লোকনাট্যের পর্যায়ভুক্ত। লোকনাট্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সমস্ত রকমের বৈশিষ্ট্যই 'খন' পালার মধ্যে

রয়েছে। খন গান মূলত কোচ-রাজবংশী-দেশি-পলি-ক্ষত্রিয় জনসমাজের একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য হলেও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যেও তার ব্যাপ্তি যথেষ্টই।

খনের নাম ব্যাখ্যা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। ফণীন্দ্রনাথ বর্মন রাজবংশী অভিধানে 'খন' অর্থে খেত (কৃষিক্ষেত্র) বলেছেন। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 'খন' অর্থে ক্ষণ, মুহূর্তর কথা বলেছেন বাংলা ভাষার অভিধানে। ব্রজবুলি ভাষায় আবার 'খন' শব্দের অর্থ কোমলরূপ। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'খন' শব্দের যে অর্থও ব্যাখ্যা আমরা পাই তা এখন বা অখন-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। 'করবে খন', 'হবে খন' ইত্যাদি। লোকসংস্কৃতি গবেষক ধনঞ্জয় রায়ের মতে গ্রামে গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম থেকে মাঘের শেষপর্যন্ত চলে 'শরিগান'। এই বিশেষ 'ক্ষণ' (সময়ের গান)-এর 'ক্ষণ' থেকে 'খন' শব্দের উৎপত্তি। আবার অনেকের মতে 'খন' শব্দের অর্থ খনন করা, বিদীর্ণ করা। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, সব ধরনের বাধা অতিক্রম করে সমাজে ঘটে যাওয়া গ্লানি, ক্লেদ, দুঃখ-কষ্ট, প্রেমের কেচ্ছা, কৃষক পরিবারের জীবনগাথা, ব্যভিচার ও প্রবঞ্চনার কাহিনি অবলম্বনে লোকমানসে যে লোকনাট্য পরিবেশিত হয়, তাই 'খন'। সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসি-বেদনা, শোষণ- নিপীড়ন, প্রণয় কাহিনি, সমাজপতিদের ভণ্ডামি, অর্থনৈতিক দুর্দশা, প্রশাসনিক কর্তা-ব্যক্তিদের দুর্নীতি, কৃষক পরিবারের জীবনচর্যা, সমাজ-সচেতনতামূলক কাহিনি ইত্যাদি সমাজজীবনমূলক স্থানীয় ঘটনাই খনপালা বা খন লোকনাট্যের বিষয়বস্তু। 'খন' অনানুষ্ঠানিক লোকনাট্য হলেও কিন্তু খন-এর আনুষ্ঠানিক বিভাগটিও রয়েছে। এই জেলার খনের আনুষ্ঠানিক পালাগুলো হলো হালুয়া-হালুয়ানি ও বন্ধুয়ালা বা বন্ধুপুছা। তবে কালের নিয়মেই এইসব খনপালা বিলুপ্তির পথে। জেলার গঙ্গারামপুর মহকুমার কিছু অঞ্চলে এখনো বন্ধুয়ালা বা বন্ধুপুছার (আনুষ্ঠানিক ও আচারগতভাবে বন্ধুত্ব পাতানোর অনুষ্ঠান) চল থাকলেও পালা অনুষ্ঠিত হয় না।

অন্যদিকে, হালুয়া-হালুয়ানি পালাও লোকসংস্কৃতি তথা লোকনাট্যের পরিবর্তনশীলতার বৈশিষ্ট্যের ধর্ম মেনে আনুষ্ঠানিক রূপ পরিত্যাগ করে অনানুষ্ঠানিক রূপ ধারণ করে নিয়েছে। তাই 'খন'-কে এখন শুধুমাত্র অনানুষ্ঠানিক লোকনাট্য হিসেবেই গণ্য করা হয়। অনানুষ্ঠানিক খন লোকনাট্য পালাগুলির দুটি ভাগ শাস্তোরী খন ও খিসা-খন। শাস্তোরী খনপালাগুলির কাহিনিতে

শাস্ত্রীয় (বৈষ্ণবশাস্ত্র) বিভিন্ন শ্লোকের প্রভাব থাকায় শাস্তোরী খন বলা হয়। শাস্তোরী খনের পালার মধ্যে কোনো বিশেষ আচার বা কৃত্য থাকে না। উল্লেখযোগ্য শাস্তোরী খনপালাগুলি হলো নয়নশোরী, বর্মাশোরী, বিজলী সুন্দরী, গোষ্ঠবাবা ইত্যাদি। অবৈধ প্রেম, কেচ্ছা, সমাজপতিদের ভণ্ডামি ইত্যাদি বিষয় নির্ভর খিসা-খনপালার কাহিনি। উল্লেখযোগ্য পালাগুলি হলো ঢাকোশোরী, মায়্যাবন্ধকি/মাইয়াবন্ধকি, মিনতিশোরী পুলিশ মার্ডার, কারেন্টসোরী, শিসোসোরী, হালুয়া-হালুয়ানি, গাদারুর সংসার, আশাসরি ইত্যাদি। তবে প্রতি বছর নতুন নতুন পালা সৃষ্টি হলেও মাইয়াবন্ধকি ও হালুয়া-হালুয়ানি পালার পরিবেশনা ও জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ণ।

শাস্তোরী ও খিসা-খন উভয় প্রকার খনপালার ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পালার নামকরণের ক্ষেত্রে নায়িকার নামের প্রাধান্য এবং নামের শেষে শোরী/শরি বা সরি/সোরী শব্দ যুক্ত হয়। এখানে শোরী সম্মানসূচক। আর সোরী অবজ্ঞাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে জেলার ভূমিপুত্র প্রখ্যাত খনশিল্পী মাধাই মহন্তর মন্তব্য হলো--- তত্ত্বরসামৃত জ্ঞানমঞ্জুরীতে শ্রীরাধিকাকে বলা হয়েছে বৃষভানুসূতাং বৃন্দাবনেশ্বরী। বৃন্দাবনেশ্বরী— এই ঈশ্বরই আঞ্চলিক ভাষায় শোরী বা শরি। শাস্তোরী খনের বৈষ্টম বাউদিয়া-নয়ন শোরী পালার নায়িকা নয়ন শোরীর শোরী অর্থ ঈশ্বরী হলেও খিসা খনের ক্ষেত্রে তা প্রয়োজ্য হয় না। সমাজজীবন থেকে বিপথে চলে যাওয়ার কারণে খিসা খনপালার নায়িকার নামের শেষে 'শোরী'র বদলে অবজ্ঞাসূচক অর্থে সোরী বা সরি ব্যবহৃত হয়।

জেলার গঙ্গারামপুর মহকুমা অঞ্চল জুড়েই খনপালার লালন ও প্রচলন হলেও কুশমণ্ডি ব্লক অগ্রগণ্য। খন গানের সঠিক উৎপত্তি স্থান নিয়ে মতভেদ থাকলেও, অখণ্ড দিনাজপুর জেলারই যেকোনো স্থান থেকে খনগানের উৎপত্তি— এ বিষয়ে কারও আপত্তি নেই। জনপ্রিয়তার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার বাঁধন থেকে বেরিয়ে বছরের যেকোনো সময় এখন খনগানের আসর অনুষ্ঠিত হয়। আসর হিসেবে সাধারণত খোলা গোলাকৃতি জায়গাই ব্যবহৃত হয়। আসরের কেন্দ্রে অভিনেতা- অভিনেত্রী ও বাদ্যযন্ত্রীরা বসেন এবং তাঁদের চারদিকে ঘিরে দর্শকরা বসেন। খন দলে আগে শুধু পুরুষ শিল্পীরাই থাকতেন। ছেলেরাই ছুকরি (মেয়ে/মহিলা) সেজে নাচত ও স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করত। এখন অনেক খন দলেই নারীর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। এমনকী শুধুমাত্র মহিলা শিল্পী দ্বারাই পরিচালিত খন দলের সংখ্যাও একাধিক। নবাঙ্কুর মহিলা খন সম্প্রদায় (দক্ষিণ সরলা, কুশমণ্ডি), মানিকোর মহামায়া লোকসংস্কৃতি দল (মানিকোর কুশমণ্ডি), শিবশঙ্কর খন সংস্থা (মলানীপাড়া, সরলা, কুশমণ্ডি) ইত্যাদি মহিলা খন দলগুলির দৃষ্টান্ত। মহিলা খন দলের ক্ষেত্রে মহিলারাই পুরুষ সেজে পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। বাজিয়া-সহ একটি খন দলে ১০-১৫ জন থাকেন। খনপালা উপস্থাপনে সহযোগী হিসেবে যেসব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয় সেগুলি হলো— খোল, করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গ, দোত্রা, খমক, বাঁশি, ঢোল ইত্যাদি। এছাড়াও সময় বিশেষে কখনো কখনো ডুগি-তবলা, হারমোনিয়াম ও ক্যাসিওর ব্যবহার হয়ে থাকে। শিল্পীরা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচেন। এই জেলার সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত লোকভাষা 'কামরূপী বাংলা' ও 'কোটিবর্ষ' উপভাষাই খনপালার সংলাপ ও গানে ব্যবহৃত হয়। খনপালার সংগীতের সুরে এখন বন্ধুয়ালার সুর ছাড়াও ভাটিয়ালি, ভক্তিগীতি, কীর্তন, রামপ্রসাদী, ঝুমুর প্রভৃতি গানের সুরের প্রভাব যথেষ্ট।

পালার প্রস্তুতি পর্বে 'খোলাবন চাপড়ানো' বা কনসার্ট বাজান বাদ্যযন্ত্রীরা। এরপর যথারীতি আসর-বন্দনা শুরু হয় এবং বন্দনার পরে মূল পালাগান আরম্ভ হয়। শিল্পীরা পালার গানগুলি কী গাইবেন আগেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন কিন্তু নাটকে ব্যবহৃত সংলাপ সম্পূর্ণত তাৎক্ষণিক। গদ্য সংলাপের পাশাপাশি গীতি সংলাপের রীতি লক্ষ্য করা যায়। বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে গান ও সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে নাচ পরিবেশিত হয়। আসরে গান ও নাচের লয় অতি ধীর এবং নাচের রীতিটিও লক্ষণীয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী একক বা দলগত নাচও দেখতে পাওয়া যায়। আবার আসরের একটি পর্যায় থেকে অন্য পর্বে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে শূন্যতা পূরণের জন্য কিছু নাচ পরিবেশনেরও চলন আছে। যে সমস্ত গান পালায় গাওয়া হয় পর্ব অনুসারে গানগুলির আলাদা আলাদা সুর থাকে এবং নির্ধারিত পর্ব ছাড়াও আলাদাভাবে বিষয়ভিত্তিক ছুটগান গাইবার রীতিও দেখা যায়। বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে গানের কোনো কোনো নির্দিষ্ট অংশ সরল ও সরসভাবে গদ্য সংলাপে ফুটিয়ে তোলা হয়।

অভিনয়ের কোনো কোনো বিষয়বস্তু সংলাপের কাঠামোর ক্ষেত্রে কুশীলবদের মধ্যে কিছু কিছু বোঝাপড়া থাকে। সংলাপ নির্মাণে উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগ মুনশিয়ানার পরিচয় বহন করে। সংলাপের মাত্রা অনুসারে হালকা শব্দ কখনো গম্ভীর হয়ে ওঠে আবার গম্ভীর শব্দ হালকা রূপে ব্যবহৃত হয়। সংলাপ নির্মাণে আরও একটি বিশেষত্ব হলো আঞ্চলিক বা স্থানিক লোকভাষার প্রয়োগের বৈচিত্র্য। শব্দ ভেঙে এবং শব্দ জুড়ে নানান ধরনের মজা করে বিকৃত উচ্চারণের মাধ্যমে রাগরসিকতার পরিমণ্ডল তৈরি হয়। সংলাপে যমক-শ্লেষের ব্যবহার লক্ষণীয়।

দক্ষিণ দিনাজপুরের খনগানে লোকশিক্ষার বিষয়টি জড়িয়ে থাকে প্রায় প্রতিটি পালায়। দেশি-পলি-কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা, পেশা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ, আতিথেয়তা, প্রথা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার-সহ আরও বিভিন্ন বিষয়ের উপাদান পাওয়া যায় খন-খিসা বা শাস্তোরী খনগানগুলিতে। অর্থনৈতিক অবস্থা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য-সচেতনা, পরিবেশ দূষণরোধ, বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষনিধন রোধ, খরা, বন্যা, ঘুষ, উপঢৌকন, ভেজাল ইত্যাদি বিষয়ে খনগানের কুশীলবরা গণচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ কাজটি পালার মাধ্যমে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। শুধু অন্ধ-আবেগজনিত বঞ্চনা বা ক্ষোভের কথাই প্রকাশ হয় না, লোকায়ত মানসিকতায় যুক্তিনিষ্ঠ শৃঙ্খলাবোধ, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, কুসংস্কার রোধ, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিরোধ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি খনগানের বাণী ও বিন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া, কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিচয়ও খনগানে পাওয়া যায়। □

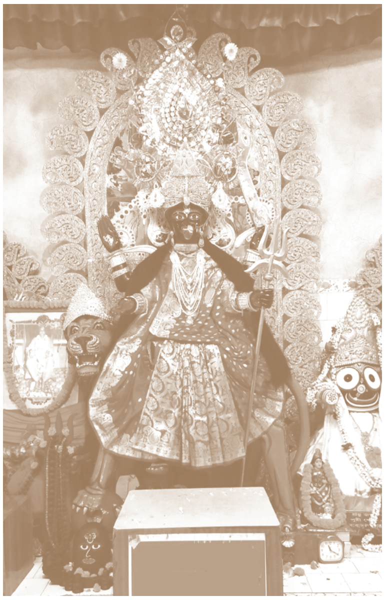

বিপত্তারিণী

ভাষার অণুজ উপাদান-নির্ভর পর্যবেক্ষণ

শ্যামলচন্দ্র দাস

বিপদ শব্দের অর্থ হলো ঝুঁকি, সংকট বা দুর্গতি। 'বি' (বিশেষ বা অভাব) ও 'পদ' (পা) মিলিয়ে শব্দটি তৈরি। বাচ্য অর্থ দাঁড়ায়— যে পরিস্থিতিতে পা পিছলে যায় বা অবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তাই 'বিপদ'। অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থান বা পদের সঙ্গে 'বি' উপসর্গটি যুক্ত হয়, তখন তা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত হওয়া বা দূরে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। স্বাভাবিক চলার পথ থেকে বিচ্যুতি বা পা পিছলে হড়কানো তথা পতিত অবস্থাই হলো বিপদ। শুধু ব্যক্তিগত নয়, পারিবারিক, সামাজিক, দেশীয় বা প্রশাসনিক দুর্নীতি, অনাচার করলে বিপদ বেড়ে যায়— 'অনাচার করো যদি, রাজা তবে ছাড়ো গদি, যারা তার ধামাধারী, তাদেরও বিপদ ভারী' (হীরক রাজার দেশে)। একদা পশ্চিমবঙ্গে যে দল শাসক ছিল সেই তৃণমূলের বর্তমান দুরবস্থা দেখলেই তা বোঝা যায়। অবশ্য আপদের সঙ্গে এই বিপদের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কেননা আপদ হলো বিপদের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ। চলতি কথায় যাকে বলা হয় উটকো ঝামেলা, তা হলো আপদ। কিন্তু বিপদ আরও বেশি গম্ভীর, গুরুগম্ভীর; ব্যক্তি পরিবার এতে চরমভাবে বিপর্যস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এই বিপদ থেকে রক্ষা বা পরিত্রাণের জন্য কেউ প্রত্যাশা করে মানবিক সাহায্য, কেউ-বা করে মানসিক সহযোগিতা, কেউ-বা চায় আধ্যাত্মিক আশ্রয়, যাতে মানসিক শান্তি-সুস্থিতি, স্থির আত্মবিশ্বাস, স্বাবলম্বনের ভাব জেগে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মতো সকলে তো আর মানসিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে পরম সত্তাকে বলতে পারে না আত্মত্রাণের কথা— 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা/বিপদে আমি না যেন করি ভয়' (রবীন্দ্রনাথ)। এই ত্রাণ আত্ম হোক বা পরার্থে, তাতে যে নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে নিষ্ক্রমণের আন্তরিক প্রয়াস নিহিত থাকে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ত্রাণ বা তারণ মানে হলো মুক্তি, পারকরণ, উদ্ধারকরণ। আবার তারক হলো ত্রাণকর্তা, রক্ষাকারী, উদ্ধারকর্তা, পথপ্রদর্শক। তারিণী— ত্রাণকারিণী, পরিত্রাণকারিণী, উদ্ধারকারিণী, নিস্তারিণী। বিপত্তারক ও বিপত্তারিণী পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, যা বিশেষ বিশেষ দেব ও দেবীকে হিন্দু সনাতন সংস্কৃতিতে চিহ্নিত করে থাকে। বিপত্তারিণী আসলে দেবী দুর্গার অন্য এক রূপ, যা হিন্দু সনাতন সমাজে তুলনায় বেশি করে প্রচলিত।

এই 'বিপত্তারিণী'-র মতো ব বর্ণ সূচক দেবদেবীর নাম বাঙ্গালি হিন্দুর আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে যথেচ্ছ সুলভ। যেমন ব্রহ্মা, বটুক ভৈরব, বগলামুখী, বাগদেবী তথা বিদ্যাদেবী, বলরাম, বিষ্ণু, বামন, বহুলা তথা দুর্গা। 'বিপত্তারিণী' দেবীর নামবাচক শব্দ, যে শব্দ পার্থিব সনাতনী ভক্তদের রক্ষার জন্য সৃষ্ট বলেই আমাদের মনে হয়। যেখানে আত্মত্রাণ বা পার্থিব পরত্রাণ সম্ভব নয়, সেখানে দেবী বিপত্তারিণীর অদৃশ্য কৃপা, নেপথ্য মহিলা, দৈবী আশীর্বাদ সামাজিক ভক্তদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত প্রার্থিত।

অবশ্য উল্লিখিত শব্দের সূচনা হয়েছে ব বর্ণ দিয়েই। যদিও বাংলা ভাষার ব-এর দুটি লিপি রয়েছে— একটি বর্গীয়, অপরটি অন্তঃস্থ। এক্ষেত্রে শব্দের সূচক বর্ণ ব হলো বর্গীয় এবং শব্দটিতে দুটি দ্বি-ওষ্ঠ্য বর্ণ 'প' ও 'ব' ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে ঘোষবৎ বর্ণ ব, পরে অঘোষ বর্ণ প আছে। দুটি বর্ণ উচ্চারণে বাতাস লাগে, মুখ দিয়ে বাতাস বের হয়; ব-তে একটু বায়ুর প্রাবল্য বেশি লাগে, প-তে একটু অল্প লাগে। অর্থাৎ মুখ দিয়ে বাতাস বেশি বেরোয় ব উচ্চারণে, আর মুখ দিয়ে অল্প বাতাস বেরোয় প উচ্চারণে, যদিও বাঙ্গালী উপভাষার ফ-এর উষ্মতা থাকে না। ত, ন হলো দন্ত্যমূলীয়। এই বর্ণ দুটি উচ্চারণে কাঠিন্য বর্জিত তারল্য, কোমলতা ঘোষিত হয়। র শক্ত তালুতে জিভের ফলক ঠেকে উচ্চারিত হয় বলে কাঠিন্যসূচক— 'কঠোরতা ও কর্কশতা সূচনা করে' (ধ্বনি-বিচার)। এইভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ওষ্ঠ থেকে দন্তমূল হয়ে শক্ত তালু পর্যন্ত এই শব্দের উচ্চারণ অন্তর্মুখী হতে থাকে। প্রকৃত ভক্তির আরাধনা-সমর্পণও তদনুরূপ। 'জাঁকজমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে/ অন্তরেতে করলে পূজা, জানবে না রে জগজ্জনে' (সাধক রামপ্রসাদ)। ভক্তি তাই অন্তরস্থ, অন্তঃস্থলোৎসারিত হলে দেব-দেবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়, হয় নিগূঢ়।

এই ব আবার বায়ুর প্রতিনিধি। আগেই বলেছি, প ও ব উচ্চারণে মুখের বাতাস প্রবাহিত হয়। প্রাকৃতিক বাতাসে থাকে অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি, যা প্রাণকে সজীব রাখতে সহায়তা করে। কাজেই, ব প্রাণশক্তিরও প্রতীক। এই বায়ু তথা প্রাণশক্তি, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সচল থাকে। ফলে সর্বত্র বিরাজমান এই প্রাকৃতিক বাতাস জীবনধারণের শক্তি যোগায়, কেননা তার মধ্যে অক্সিজেন ইত্যাদি একাধিক প্রাণ-ধারক উপাদান লব্ধ।

ব যদিও বহ্নি ও বায়ুর সমন্বিত রূপকেও বোঝায়। আবার ব বর্ণের আরও

একটা অর্থ হলো বারি, সমুদ্র, যার দেবতা বরুণ। এতে বরুণবীজও বোঝায়। অর্থাৎ জলের ধর্ম এর মধ্যে বিরাজমান। জলের অপর নাম জীবন। এই জীবনাদি সর্জনের একটি উপাদানের মধ্যে অন্যতম জল। বস্তুত বাংলা ভাষার শব্দে প্রযুক্ত ব সৃষ্টিরও প্রতীক। আবার সৃষ্টি ও পালনে প্রকৃতির ভূমিকা স্বীকার করে বাংলা প বর্ণ। পালক, রক্ষক, পানকারক, পাত্র, বায়ু ইত্যাদিকেও বোঝায় প। যাইহোক, ইংরেজি ভাষার বর্ণ 'বি' হলো চন্দ্র বা মায়ের মতো কোমল, পালনকারী শক্তির ধারক বর্ণ। দেবী বিপদতারিণী বিপদ-দুর্গতি নাশ করে ভক্তদের লালন করেন, শান্তি-স্বস্তি প্রদান করেন।

এই ব আবার ব্রহ্ম তথা মহাজগতের পরম সত্য, যা বিস্তৃত, তার মূল উৎস। প্রণব ও পরমাত্মাকে ধারণ করে থাকে প। সেদিক থেকে প্রকৃতি ও পরমাত্মা তথা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে এই প ও ব বর্ণ। যোগসূত্র স্থাপন বা রক্ষার জন্য তড়িঘড়ি করলে হয় না, তা গড়ে উঠতে সময় লাগে, অগ্রগতির জন্য লাগে ধৈর্য্য, যা ইংরেজি 'পি' বর্ণে আভাসিত হয়। এমনকী মহাজাগতিক, ঐশ্বরিক শক্তিকে বহনের পারঙ্গমতা, আধ্যাত্মিকতায় অনুগত থাকাও ইংরেজি 'বি' বর্ণে বিদ্যমান। যদিও বাংলা ভাষার ব ঐশ্বরিক প্রেমের প্রতীক। ইংরেজি বি বর্ণের মতো বাংলা প বর্ণ প্রেম, পরম পবিত্রতা, পরোপকার, প্রার্থনা ইত্যাদিকে আভাসিত করে। আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও ভক্তির প্রসারে সমর্পিত মনোভাব চালনায় ব-এর ভূমিকা রয়েছে। যোগ সাধনার ক্ষেত্রে চক্রের জাগরণ ও স্থিরতা আনতে 'বং' শক্তিশালী বীজমন্ত্রও বটে।

ইংরেজি ভাষার বি বর্ণ প্রেম-করুণা ও ঐক্য বা সম্পর্ক স্থাপন তথা সংযোগের প্রতীক। অন্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করা, সহানুভূতি জাগানোও বোঝায়। ইংরেজি বি বর্ণ আসলে দ্বৈততা ও ভারসাম্য, জীবনের আলো-অন্ধকার, মন্দ-ভালোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, বিপদ ও বিপদোত্তীর্ণ অবস্থায় সমতা আনয়ন ইত্যাদি দ্যোতিত করে। বাংলা ব শান্তি, গভীর সংযোগ ও মানসিক ভারসাম্যেরও প্রতীক।

ত কেবল তপস্যা, ত্যাগই নয়, ত্রাণ বা তারণও বটে। এই ত আসলে ক্রোড়, যা আশ্রয় দেয়, লালন করে। হাজার রকম বিপদ, সংসার-ঝক্কি থেকে সাধনাকারীকে নিরাময়ে সাহায্য করে, মানসিক শান্তির জন্য অদৃশ্য আশ্রয় দেয়। যেহেতু এই ত-এর সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্ভব। বস্তুজগতের বাইরে যে সূক্ষ্ম সত্য রূপ অমৃত আছে, সে সম্পর্কে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। ফলে জাগতিক মোহ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও তৈরি হয় এই ত-র সাহায্যে। ফলে মানুষের ভেতরের একাগ্রতা, সংযম, কঠোর সাধনা, ভক্তির মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি যেমন জেগে ওঠে, তেমনি সমস্ত জাগতিক কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, আসক্তি-অহংকারাদি পরমসত্তায় সঁপে দেওয়াও অনেক সময় তৈরি হয় এই ত বর্ণের সাহায্যে। এমনি করে তৈরি হয় ভক্ত মানুষের সঙ্গে ঐশ্বরিক সংযোগ সম্পর্ক। এই সংযোগ অবশ্য আরও বেশি দৃঢ় এবং গভীর হয় এক্ষেত্রে, কারণ দেবীবাচক শব্দটিতে দুটি ত বর্ণ রয়েছে।

প বর্ণের মতো 'র' অগ্নিতত্ত্ব, দিব্যজ্যোতি, সক্রিয় শক্তি তথা শিব ও প্রকৃতির প্রতীক। এই র আগুনেরও চিহ্নায়ক, যা আত্মিক, জাগতিক অভ্যন্তরীণ তেজকে জাগ্রত করে, দীপ্তিমান আলো, ঔজ্জ্বল্যকে আভাসিত করে। হজম শক্তি তথা আগুনের সঙ্গে সংযোগ থাকায় নাভিমূল স্থিত 'মণিপুর' চক্রের সঙ্গে এই বর্ণটি যুক্ত। শুধু তাই নয়, এই র বর্ণটি আসলে রক্ষা বীজ, যা ভক্তকে অশুভ শক্তি, নেতিবাচকতা, ব্যাধি ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে থাকে, যদি ভক্ত হয়ে থাকে ভগবান তথা পরমসত্তার প্রতি সমর্পিত প্রাণ।

মূর্ধন্য-ণ আসলে শিব, জ্ঞান, ভূষণ ইত্যাদির ব্যঞ্জক। শুধু তাই নয়, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির নিয়ন্ত্রক দেব গণেশকেও ব্যক্ত করে। দিবা আনন্দ বা পরমানন্দ এই বর্ণে আভাসিত হয়ে থাকে, কারণ 'কৃষ্ণ' শব্দে কৃষ্-এর অর্থ হলো জন্মের আকর্ষণ বা পুনরাবৃত্তি, আর মূর্ধন্য-ণ হলো আনন্দ; কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হলো জাগতিক দুঃখ থেকে মুক্ত করে আনন্দ প্রদান। শুধু তাই নয়, মোক্ষ প্রাপ্তি বা নির্বারণের আভাস এই বর্ণে থেকে যায়। এইভাবে দেখলে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মিলন ও নিয়ন্ত্রণ এই বর্ণে যেমন বিদ্যমান, তেমনি জাগতিক সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে পরম শান্তিতে উপনীত হওয়ার ইঙ্গিতও এতে লব্ধ।

আবার শব্দটিতে হ্রস্ব-ই ও দীর্ঘ-ঈ কার প্রযুক্ত হয়েছে। দুবার হ্রস্ব-ই কার, একবার দীর্ঘ-ঈ কার। ই-কার সাধারণত মৃদু, স্নিগ্ধ, নম্র ভাব ব্যঞ্জক। দ্বিতীয় ই-কার সম্ভবত হীনতা বা নঞর্থক ভাব সূচক। আবার এও হতে পারে দেবীর আশীর্বাদকৃত প্রজ্ঞা, অন্তর্জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জাগরণ, এমনকী মনের ভেতরের তৃতীয় চোখের জ্যোতির উন্মোচন এই বর্ণে আভাসিত হতে পারে। সাধারণত যোগ সাধনা বা ধ্যানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ই-উচ্চারণ মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে স্থিরতা ও মানসিক শান্তি গাঢ় করতে। আবার নারীশক্তি, প্রকৃতি তথা ধরিত্রী মাতার ঐশ্বরিক মাতৃভাব, সৃষ্টি ও লালন-পালন, এমনকী তার শ্বাস-প্রশ্বাস এই বর্ণে নিহিত থাকা অসম্ভব নয়।

আ-কার সাধারণত সৃষ্টির উন্মুক্ততা, অনন্ত মহাশূন্যতা, পূর্ণতা, প্রকাশিত আনন্দ, সুখবোধ, স্বস্তি, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের আলো তথা মুক্তির দিকে অভিযাত্রা ইত্যাদি যেমন ব্যক্ত করে, তেমনি ক্ষুদ্র 'আমি' বা অহংকারকে এড়িয়ে বিশ্বজনীন 'আমি'-র সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আভাসও প্রকট হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাস্তব জগতে স্থিত হয়েও দিব্য চেতনা ও পরমাত্মার যুক্ত হওয়ার সদাকাঙ্ক্ষাও এই বর্ণে ব্যক্ত হয়ে থাকে।

এইভাবে দেখলে বিপদ শব্দের ভেতরে নিহিত রয়েছে বি-পদ। তা থেকে রক্ষা করবার জন্য স্মরণ করা দরকার তারিণী অথবা সামগ্রিকভাবে বিপত্তারিণী নামক দৈবী প্রভাবযুক্ত আধ্যাত্মিক শব্দ। কীভাবে এই শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে নানামুখী সামাজিক, আধ্যাত্মিক, ভাষাতাত্ত্বিক ইত্যাদি গভীর তাৎপর্য, তারই অনুসন্ধানের প্রয়াস এক্ষেত্রে করা হয়েছে। □

বাংলাদেশে একাত্তরের মতো আরেকটি হিন্দু গণহত্যার উসকানি

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ 'হিন্দুরা খুব বেড়েছে। এদের উপর আরেকটা অপারেশন সার্চলাইট চালানো ফরজ হয়ে গেছে। কিন্তু অপারেশনটা চালাবে কে, বাংলাদেশ আর্মির কি সেই ক্ষমতা আছে? পাক আর্মি পেরেছিল। ১৯৭১-এ ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে জগন্নাথ হলের হিন্দুদের জাহান্নামে পাঠিয়েছিল। সারা ঢাকা শহর জুড়ে খুঁজে খুঁজে হিন্দুদের হত্যা করেছিল। তার সঙ্গে ভারতীয় প্রক্সি মুক্তিযোদ্ধা নামক সন্ত্রাসী, আওয়ামি লিগ, ছাত্রলিগ, নাস্তিক মুরতাদ, বামপন্থী, কমিউনিস্টদের সাইজ করেছিল। কিন্তু আপনারা বুঝলেন না, সব দোষ দিয়েছেন পাকিস্তানের উপর, পাক আর্মির উপর। এখন তো বুঝতে পারছেন! পাক আর্মির উদ্দেশ্য ছিল, পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দু ও ভারতীয় প্রক্সি দালাল আওয়ামি লিগকে খতম করা। কিন্তু আপনারা তা হতে দেননি, আপনারা ভারত, লিগ আর হিন্দুদের সাথে মিলে এক পাকিস্তান ভেঙেছেন। এখন বুঝেন মজা!'

তৌফিক মাহদি নামে একজনের এই 'বার্তা'টি ফেসবুকে ঘুরছে। এই ভয়ংকর কথাবার্তা বাংলাদেশ সরকারকে কোনোরকম বিব্রত কিংবা উদ্বিগ্ন করেছে মনে হয় না। ওই বার্তায় 'অপারেশন সার্চলাইট'- এর কথা বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গণহত্যার এই অভিযান শুরু করেছিল বাঙ্গালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা গুঁড়িয়ে দিতে। ওই রাতটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে 'কালো রাত' হিসেবে চিহ্নিত। তৌফিক মাহদি ওই রাতকে স্মরণ করছে, কারণ পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যার এই অভিযানটির সূচনা করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক হিন্দু ছাত্রাবাস 'জগন্নাথ হল'-এ হামলা চালানোর মাধ্যমে। ওই কালো রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর হামলায় জগন্নাথ হলে আড়াইশো থেকে তিনশোরও বেশি ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারী প্রাণ হারান। তৎকালীন প্রত্যক্ষদর্শী ও বিভিন্ন গবেষণায় হলের মাঠে শত শত মৃতদেহের 'গণকবর'-এর এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ওই এক রাতেই পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা শহরে ৩৫ হাজারেরও বেশি বাঙ্গালিকে হত্যা করে।

যে বার্তায় তৌফিক মাহদি জগন্নাথ হলে পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয় হামলাকে স্বাগত জানিয়ে তার পুনরাবৃত্তি কামনা করছে, সে রাতটির একটি খণ্ড বর্ণনা ইতিহাসের অধ্যায় থেকে তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশে আইন ও প্রশাসন হিন্দু ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভূমিকা পালন করছে। এটা বাংলাদেশের বর্তমান সংস্কৃতি নয়, গত সাড়ে পাঁচ দশক ধরেই হিন্দুধর্মের এভাবে অবমাননা করা হচ্ছে। ইসলাম অবমাননার অভিযোগে হিন্দুরা ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অথচ হিন্দু নির্যাতনের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন বিভিন্ন অজুহাতে হিন্দুদের বিচার দিতে অপারগ।

'২৫ মার্চ সারাদিন প্রতিবাদমুখর ছিল গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। একটা কিছু ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন অনেকেই। তবে ঘটনার বিশালত্ব এতো বড় হবে এবং এতো মারাত্মক হবে কেউই অনুমান করতে পারেননি। যারা অনুমান করতে পেরেছিলেন তারা অনেক আগেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিত্যাগ করে বাড়ি কিংবা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছেন। জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অধিকাংশই গরিব, তাদের উচ্চশিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হয় টিউশানি করে। ফলে এই হলের অধিকাংশ ছাত্রই থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিল। রাত বারোটার পরে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের দিকের দেওয়াল ভেঙে পাকিস্তানি বাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে জগন্নাথ হলে প্রবেশ করে এবং প্রথমেই মর্টার ছোঁড়ে উত্তর বাড়ির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় হলের সবাইকে বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয় পাক সেনারা। এরপর জগন্নাথ হলের অভ্যন্তরে শুরু হয় নারকীয় হত্যাকাণ্ড। উত্তর ও দক্ষিণ বাড়ির প্রতিটি কক্ষ অনুসন্ধান করে ছাত্রদের ওপর নির্বিচারে গুলি করা হয়। টয়লেট ও ছাদে রক্ষিত জলের ট্যাঙ্কের নীচে লুকিয়ে থেকেও রেহাই পায়নি কেউ। যাকে যেখানেই পাওয়া গেছে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। পশ্চিম দিকে টিনশেড অর্থাৎ পশ্চিম ভবন নামে পরিচিত আবাস, ক্যান্টিন এবং ক্যান্টিন-সংলগ্ন ছাত্রাবাসে গান পাউডার ছড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সর্বগ্রাসী আগুন থেকে রক্ষা পেতে যারা বেরিয়ে আসে তাদের ওপর শুরু হয় নির্বিচার গুলিবর্ষণ। এর পর আক্রান্ত হয় হলের প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ, বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবের বাসভবন। হলের তৎকালীন প্রাধ্যক্ষ

ফঃ ৫

অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার বাসভবন, অধ্যাপক ড. অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ও অন্যান্য শিক্ষকদের আবাসে।'

'বেঁচে যাওয়া ও আতঙ্কে পলায়নপর ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের ধরে এনে জগন্নাথ হলের বিভিন্ন ভবনে পড়ে থাকা মৃতদেহ বহন করে মাঠে নিয়ে আসতে বাধ্য করা হয়। রাইফেল ও বেয়নেটের মুখে সহপাঠীদের মৃতদেহ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের মৃতদেহ বহন করেন তারা। এরপর সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিবমন্দিরের সাধুরাও ছিলেন। ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের অনেকে। পাকিস্তানি বাহিনী মেশিনগান চালিয়ে তাদের নির্বিচারে হত্যা করে। কিছুক্ষণ পর পাকিস্তানি বাহিনী বুলডোজার নিয়ে আসে এবং গর্ত করে জীবিত-মৃত সবাইকে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কয়েকজন তখনো বেঁচে ছিলেন, আর্তচিৎকার করছিলেন। মাটিচাপা দেওয়ার পর অনেকের হাত-পা মাথা মাটির ওপরে ছিল। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে পাকিস্তানি বাহিনী জগন্নাথ হল ত্যাগ করে।'

'২৭ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্টোদিকে রেসকোর্স ময়দানের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত ঐতিহাসিক রমনা কালীমন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রমে হামলা করে। ২৫ মার্চের কালো রাতের পর ঢাকা শহরে টানা সান্ধ্যআইন (কার্ফু) জারি ছিল। রমনা কালীমন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রমে সাধু ও ভক্তরা ছাড়াও অনেক সাধারণ হিন্দু আটকা পড়েছিলেন। কিছু পরিবার সেখানে থাকতো, মন্দির ও আশ্রমের কাজ করতো। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মন্দিরে প্রবেশ করে চারদিকে ঘিরে ফেলে, ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবর্ষণ করে। এক পর্যায়ে মন্দিরের সেবায়েত পরমানন্দ গিরি-সহ সেখানে অবস্থানরত সবাইকে প্রাঙ্গণে জড়ো করা হয়। কয়েকটা শিশু কান্নাকাটি করছিল। তাদের আছাড় মেরে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী। পাকিস্তানি বাহিনী পরমানন্দ গিরি-সহ সবাইকে কলেমা পড়ে মুসলমান হতে বাধ্য করে। তারপরও সবাইকে হত্যা করে এবং মৃতদেহ জড়ো করে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে গণ-তদন্ত কমিশনের সামনে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছেন অদূরে অবস্থিত মোগল আমলে নির্মিত মসজিদের ইমাম। গণ-তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে পাকিস্তানি বাহিনীর হামলায় রমনা কালীমন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম হত্যকাণ্ডে একশোরও বেশি নিহত হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের হত্যাকাণ্ড স্মরণ করিয়ে দিয়ে কার্যত হিন্দুদের প্রতিই ভয়ংকর বার্তা দিচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান তৌহিদি জনতার প্রতিনিধি তৌফিক মাহিদ। বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত এই উসকানির বিরুদ্ধে নিশ্চুপ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী যে গণহত্যা চালিয়ে ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল, তার সিংহভাগ ছিলেন হিন্দুরা। যে এক কোটিরও বেশি মানুষ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের মাটিতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের প্রায় নব্বই ভাগই হিন্দু। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের হামলায় অসংখ্য বাড়িঘর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মাটিতে মিশে গিয়েছিল, তারও সিংহভাগ ছিল হিন্দুদের। তারপরও 'বাংলাদেশ'-এর অভ্যুদয় ঠেকানো যায়নি, ৯০ হাজারেরও বেশি সেনা নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেছিল ভারতের লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে।

বাংলাদেশের হিন্দুদের এমন এক সময়ে পাকিস্তানি বাহিনীর হিন্দু হত্যার কথা মনে করিয়ে দিয়ে হুমকি দেওয়া হলো, যখন গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে একটি মন্দির কমপ্লেক্সে শ্রীরামমূর্তি নির্মাণকে কেন্দ্র করে 'ইসলামি জোস' বেড়ে গেছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে, মন্দিরের বাইরে কোনো মূর্তি গড়া যাবে না। বড়ো মূর্তি তো নয়ই। এসব মূর্তি ভেঙে ফেলতে হবে। মোল্লারা আইএস-এর পতাকা নিয়ে মিছিল করে শ্রীরামচন্দ্রের ছবিতে জুতো মেরেছে।

এর প্রতিবাদে সর্বস্তরের হিন্দুদের মধ্যে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। দেশজুড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ, মানববন্ধন ও প্রতিবাদ মিছিল হচ্ছে। বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদের সঙ্গে দেখা করে ভগবান শ্রীরামকে অবমাননাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি দাবি করেন। হিন্দুরা এবারের নির্বাচনে আওয়ামি লিগের অনুপস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামি ও অন্যান্য ইসলামি দলকে ঠেকাতে ব্যাপকভাবে ভোট দিয়েছিল বিএনপিকে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, এও বলেছেন, হিন্দুরা এভাবে বিএনপিকে সমর্থন না জানালে ভোটের চিত্র অন্যরকম হতে পারতো। স্বাভাবিকভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশকে নির্দেশ দিলেন এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে। পরের দিন পুলিশের আইজি পূজা পরিষদের নেতাদের জানালেন, গাইবান্ধার পুলিশ সুপার তাঁকে জানিয়েছেন, শ্রীরামের ছবিতে জুতো নিক্ষেপের ঘটনায় হিন্দুদের কেউ বাদী হতে চাইছেন না। ভয় পাচ্ছেন। কাজেই কাউকে গ্রেফতার করা যাচ্ছে না। হিন্দু নেতারা বলেন, সরকার বা প্রশাসন বাদীপক্ষ হতে পারে। পুলিশ আইন দেখালো, ইসলাম অবমাননার ক্ষেত্রে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকেই অভিযোগ করতে হবে অর্থাৎ বাদীপক্ষ হয়ে মামলা করতে হয়।

অথচ ভিন্ন রূপ দেখা গেল মাত্র এক সপ্তাহে— (১) ফেনীতে তৌহিদি জনতার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম অবমাননার অভিযোগে ফেনী সরকারি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী সৃজন দাশকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ বাদীপক্ষ হয়ে সৃজনের বিরুদ্ধে মামলা করেই গ্রেপ্তার পর্ব শেষ করেছে। (২) সুনামগঞ্জে তাহিরপুরে ২৩ জুন দীপ্ত রায় নামে এক ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ইসলাম অবমাননার অভিযোগে। এখানেও পুলিশ বাদীপক্ষ হয়ে মামলা করেছে। দুই ক্ষেত্রেই অভিযোগ ইসলাম ও মহানবিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়েছে। ফেনী ও সুনামগঞ্জে তৌহিদি জনতার নামে উগ্র ইসলামপন্থীরা অভিযুক্তদের বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাট করে। সুনামগঞ্জে একটি মন্দিরেও হামলা করা হয়।

হিন্দুরা শ্রীরামচন্দ্রের ছবিতে জুতো মারার ঘটনায় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করছে, কোনো হিংসায় জড়িয়ে পড়েনি। তাঁরা আইনের প্রয়োগ চাইছে, কিন্তু ইসলাম অবমাননা নিয়ে আইন ও প্রশাসন হিন্দু ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভূমিকা পালন করছে। এটা বাংলাদেশের বর্তমান সংস্কৃতি নয়, গত সাড়ে পাঁচ দশক ধরেই হিন্দুধর্মের এভাবে অবমাননা করা হচ্ছে। ইসলাম অবমাননার কারণে হিন্দুরা ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে ফিরছে। □

নতুন পশ্চিমবঙ্গের সন্ধানে কল্যাণের গণ্ডি পেরিয়ে উন্নয়নের পথে রাজ্য বাজেট

অরিত্র ঘোষ দস্তিদার

একটি বাজেট কেবল আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়; এটি একটি সরকারের অর্থনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন। পশ্চিমবঙ্গ বাজেট ২০২৬-২৭ সেই অর্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কারণ এই বাজেটের মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনীতিকে শুধুমাত্র দানখয়রাতি নির্ভর কাঠামো থেকে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানভিত্তিক উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়ার একটি প্রয়াস দেখা যাচ্ছে।

বাজেটের মূল প্রশ্ন হলো, পশ্চিমবঙ্গ কি আবারও পূর্ব ভারতের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজের অবস্থান পুনর্নির্মাণ করতে পারবে? উত্তর নির্ভর করবে ঘোষণার চেয়ে বেশি বাস্তবায়নের উপর।

বাজেট বিশ্লেষণ করলে চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে— পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়নের পুনর্জাগরণ, মানবসম্পদে বিনিয়োগ এবং কৃষির আধুনিকীকরণ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। রাস্তা, সেতু, পরিবহণ ও লজিস্টিক ব্যবস্থার উন্নয়ন শুধু যাতায়াত সহজ করে না, বরং শিল্প ও বাণিজ্যের খরচ কমায়।

বাজেটে নিউ টাউন এলিভেটেড করিডোর, ডানকুনি-মগরা রোড করিডোর, ময়ূরাক্ষী সেতু এবং নন্দীগ্রাম-হলদিয়া সংযোগের মতো প্রকল্পগুলির মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো 'অ্যাগ্লোমারেশন ইকোনমিক্স', অর্থাৎ যেখানে উন্নত পরিকাঠামো তৈরি হয়, সেখানে শিল্প, পরিষেবা ও কর্মসংস্থান একত্রিত হতে শুরু করে।

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান সুবিধানজক। বন্দর, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার এবং বড়ো বাজার— সবই রয়েছে। কিন্তু এই সুবিধাকে অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তর করতে প্রয়োজন দক্ষ পরিকাঠামো ও প্রশাসনিক কার্যকারিতা।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির দীর্ঘদিনের চ্যালেঞ্জ হলো শিল্প ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। বাজেটে বিনিয়োগ প্রসার, শিল্প ক্লাস্টার, লজিস্টিক পার্ক, শিল্প করিডোর এবং Ease of Doing Business-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা— শুধুমাত্র সরকারি ব্যয় দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান তৈরি করা সম্ভব নয়; প্রয়োজন বেসরকারি বিনিয়োগ।

অর্থনীতির ভাষায়, বিনিয়োগকারীরা শুধু কর ছাড় বা সুবিধা দেখে না; তারা দেখে নীতি স্থায়িত্ব, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা।

গুজরাট, কর্ণাটক বা তেলেঙ্গানার মতো রাজ্যের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে শিল্প বৃদ্ধির জন্য পরিকাঠামোর পাশাপাশি প্রয়োজন বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তাই মূল প্রশ্ন হবে, এই নীতিগত উদ্যোগগুলি কি বাস্তবে শিল্প স্থাপনে পরিণত হবে?

একবিংশ শতকের অর্থনীতি মূলত জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর।

বাজেটে এক লক্ষ সরকারি চাকরির পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ, স্পোর্টস্ ইউনিভার্সিটি, AI Mission এবং AVGC-XR (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics and Extended Reality) ক্ষেত্রের প্রশিক্ষণের মতো উদ্যোগ

ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের দিকে নজর দেওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence আগামী দশকের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি হতে চলেছে।

যে রাজ্য AI, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পারবে, তারাই ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সুযোগের বড়ো অংশ দখল করবে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত যুবসমাজ এবং ঐতিহাসিক জ্ঞানভিত্তিক পরিমণ্ডল এই ক্ষেত্রে বড়ো সম্পদ হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব এখনও অপরিসীম। কিন্তু ছোটো জমি, বাজার সংযোগের সমস্যা এবং মূল্য সংযোজনের অভাব কৃষকের আয় বৃদ্ধির পথে বাধা।

বাজেটে কৃষকদের অতিরিক্ত সহায়তা, সেচে বিদ্যুৎ সুবিধা, ফসল বিমা, সৌর সেচ এবং উদ্যানপণ্য রপ্তানির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

তবে দীর্ঘমেয়াদে কৃষির ভবিষ্যৎ শুধু উৎপাদন বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রয়োজন কৃষিকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রপ্তানি এবং গ্রামীণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করা।

বিশ্বের সফল অর্থনীতিগুলিতে কৃষি একা দাঁড়িয়ে থাকে না; কৃষির সঙ্গে শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রের সংযোগ তৈরি হয়।

উন্নয়নমূলক অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো— বৃদ্ধি ও সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য কীভাবে তৈরি হবে?

বাজেটে মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য সহায়তা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য খাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কেইনসীয় অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, এই ধরনের সরকারি ব্যয় স্বল্পমেয়াদে বাজারে চাহিদা বাড়াতে পারে।

তবে দীর্ঘমেয়াদে এই ব্যয়কে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, যাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো— এর আর্থিক ভারসাম্য। বড়ো পরিকাঠামো প্রকল্প, সামাজিক ব্যয় এবং কর্মসংস্থান কর্মসূচির জন্য বিপুল অর্থ প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক তত্ত্ব মতে, ঋণ খারাপ নয় যদি তা ভবিষ্যতের উৎপাদনশীল সম্পদ তৈরি করে। কিন্তু যদি ব্যয় শুধুমাত্র ভোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে আর্থিক চাপ তৈরি হতে পারে।

তাই পশ্চিমবঙ্গের সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো--- সরকারি বিনিয়োগকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে তা আরও বেশি বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করে।

দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক আলোচনা আবর্তিত হয়েছে শিল্প পতন, বিনিয়োগের অভাব এবং কর্মসংস্থানের সংকটকে ঘিরে।

২০২৬-২৭ বাজেট সেই প্রচলিত ধারণাকে পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে। পরিকাঠামো, প্রযুক্তি, শিল্প, কৃষি এবং মানবসম্পদের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন অর্থনৈতিক দিশা তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সফল হলে পশ্চিমবঙ্গ আবারও পূর্ব ভারতের প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ বাজেট ২০২৬-২৭-এর সবচেয়ে বড়ো শক্তি হলো এটি স্বীকার করেছে যে শুধুমাত্র কল্যাণমূলক প্রকল্প দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। প্রয়োজন বিনিয়োগ, দক্ষতা, শিল্প, প্রযুক্তি এবং প্রশাসনিক বিশ্বাসযোগ্যতা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো বাজেট নিজে অর্থনীতি পরিবর্তন করে না। পরিবর্তন আসে বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

আগামী দিনের পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে— পরিকাঠামো প্রকল্প সময়মতো শেষ হয় কিনা, শিল্প বিনিয়োগ বাস্তবে আসে কিনা, প্রযুক্তি উদ্যোগ কর্মসংস্থান তৈরি করে কিনা এবং কৃষকের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছয় কিনা।

বাজেট একটি রূপরেখা দিয়েছে। এখন সেই রূপরেখাকে বাস্তব উন্নয়নে রূপান্তর করাই হবে সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা।

যদি তা সম্ভব হয়, তবে এটি হতে পারে পশ্চিমবঙ্গের একটি ভোগনির্ভর অর্থনীতি থেকে উৎপাদননির্ভর অর্থনীতির পথে যাত্রার সূচনা।

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

ময়দানে তালাবন্দি কাবাডি, আগাছায় ঢাকছে সোনাজয়ের স্বপ্ন

নিলয় সামন্ত

ময়দানের বুকেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কাবাডির নিজস্ব ঠিকানা। কৃত্রিম টার্ফ, কোর্ট, খেলোয়াড়দের অনুশীলনের পরিকাঠামো, এমনকী জরুরি পরিষেবার জন্য দামী অ্যাম্বুল্যান্সও। কিন্তু সেই মাঠেই এখন তালা। বৃষ্টির জলে ভিজে নষ্ট হচ্ছে টার্ফ, আগাছায় ঢেকে যাচ্ছে কোর্ট, আর বঙ্গের কাবাডি খেলোয়াড়দের ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় অনুশীলনের আশায়। মাঠ থাকতেও মাঠহীন জীবন। যেন নিজেদের রাজ্যেই তাঁরা ভবঘুরে।

বঙ্গের কাবাডিকে দীর্ঘদিন ধরেই তাড়া করে বেড়াচ্ছে সংগঠনগত বিভাজন। বর্তমানে এই খেলাকে ঘিরে রয়েছে তিনটি পৃথক সংস্থা। বহু বছর ধরে চলে আসা গোষ্ঠী কোন্দল শুধু প্রশাসনিক স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে খেলোয়াড়দের জীবনে। কোর্টের বাইরে ক্ষমতার লড়াই যত বেড়েছে, কোর্টের ভিতরে ততই কমেছে খেলাধুলার পরিবেশ।

প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই জটিল পরিস্থিতির সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারেননি। কাজটি যে সহজ ছিল না, তা রাজনৈতিক সমীকরণই স্পষ্ট করে। এক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তৎকালীন পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি। অন্য গোষ্ঠীতে ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে কাবাডির অভ্যন্তরীণ সংঘাত একসময় রাজনৈতিক প্রভাবের জটিলতায় আরও গভীর হয়ে ওঠে।

সুব্রত মুখার্জির মৃত্যুর পর ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে কাবাডির তাঁবু ও মাঠের দায়িত্ব ছিল বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীর হাতে। কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। শহিদ মিনারে রাহুল গান্ধীর নির্বাচনী সভাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার কারণে প্রথমে কাবাডি তাঁবুর ক্যান্টিন বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে সেনাবাহিনী তাঁবুর দুটি প্রধান গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। সেই তালা আজও খোলেনি। ইতিমধ্যেই প্রায় দু'মাস কেটে গিয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে কোর্টের অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে উঠেছে। বর্ষার জলে কৃত্রিম টার্ফের ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ছে। আগাছায় ঢেকে যাচ্ছে খেলার জায়গা। মাঠের এক কোণে পড়ে রয়েছে দামী অ্যাম্বুল্যান্স। রাতের ময়দান ফাঁকা থাকে। এখনো পর্যন্ত কোনো যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনা না ঘটলেও ভবিষ্যতে এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। কোটি টাকার সম্পদ কার্যত অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

সবচেয়ে বড়ো ক্ষতির মুখে পড়েছেন খেলোয়াড়রা। নিজেদের মাঠ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সেখানে অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছেন না। কখনো নৈহাটি, কখনো চন্দননগরে গিয়ে প্রস্তুতি চালাতে হচ্ছে। যাতায়াতের বাড়তি খরচ, সময়ের অপচয় এবং নিয়মিত অনুশীলনের অনিশ্চয়তা— সব মিলিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রতিভার বিকাশ। যে খেলায় শারীরিক সক্ষমতা, গতি এবং সমন্বয় প্রতিদিনের অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল, সেখানে এই পরিস্থিতি কার্যত খেলোয়াড়দের পিছিয়ে দিচ্ছে।

আশ্চর্যের বিষয়, এমন ঘটনা যদি ফুটবল বা ক্রিকেটে ঘটত, তা হলে অনেক আগেই প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হতো। প্রশাসন থেকে ক্রীড়ামহল— সব জায়গায় শুরু হয়ে যেত তৎপরতা। কিন্তু কাবাডির ক্ষেত্রে সেই সাড়া চোখে পড়ে না। মূলধারার সংবাদমাধ্যমে এই খেলার খবর খুব কমই জায়গা পায়। আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা কিংবা ক্রিকেটের ব্যস্ততার ভিড়ে কাবাডির মতো খেলাগুলি অনেক সময়ই আড়ালে থেকে যায়। অথচ একজন ক্রীড়া সাংবাদিকের কাছে সব খেলাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি খেলোয়াড়ের স্বপ্নের মূল্যও সমান।

ভারতের কাবাডি ইতিহাস গর্বের। ১৯৯৮ সালের এশিয়ান গেমসে ভারত সোনার পদক জিতেছিল। সেই সোনাজয়ী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন বঙ্গের বিশ্বজিৎ পালিত। তাঁর ক্রীড়াজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় গড়ে উঠেছিল এই ময়দানের কাবাডি কোর্টেই। একই ভাবে অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত রমা সরকারও এই মাঠেরই সৃষ্টি। বঙ্গের কাবাডির ইতিহাসে এই মাঠ শুধু একটি অনুশীলন কেন্দ্র নয়, বহু সাফল্যের জন্মস্থান। এই ঐতিহ্য আজ তালাবন্দি। নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়রা সেই উত্তরাধিকারের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একটি রাজ্যের ক্রীড়া সংস্কৃতি শুধু বড়ো বড়ো স্টেডিয়াম বা আলোচিত খেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে না। অপেক্ষাকৃত কম প্রচার পাওয়া খেলাগুলিও সেই সংস্কৃতির সমান গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কাবাডির মতো দেশীয় খেলাকে অবহেলা করলে তার প্রভাব ভবিষ্যতের প্রতিভা তৈরির উপর পড়বেই।

নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী ডা: ইন্দ্রনীল খাঁ'র সামনে এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। অতীতের সমস্ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসা জরুরি। খেলোয়াড়দের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত সমাধানের পথ বের করতে হবে। প্রয়োজনে যে সংস্থাকে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন স্বীকৃতি দেবে, তাদের হাতেই কোর্ট ও মাঠের দায়িত্ব তুলে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই খেলোয়াড়দের অনুশীলন বন্ধ থাকতে পারে না।

দেশজুড়ে 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের কথা বারবার বলা হয়। খেলাধুলার প্রসার, নতুন প্রতিভা গড়ে তোলা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। সেই লক্ষ্য যদি সত্যিই বাস্তবায়িত করতে হয়, তবে প্রথম শর্ত হলো খেলোয়াড়দের মাঠ ফিরিয়ে দেওয়া। কারণ স্লোগানে নয়, খেলোয়াড়বান্ধব সিদ্ধান্তেই ক্রীড়া উন্নয়নের প্রকৃত পরিচয় মেলে।

ময়দানের এই তালাবন্ধ কাবাডি কোর্ট আজ শুধু একটি বন্ধ দরজার প্রতীক নয়। এটি প্রশাসনিক অচলাবস্থা, সংগঠনগত দ্বন্দ্ব এবং খেলোয়াড়দের প্রতি দীর্ঘদিনের অবহেলারও প্রতিচ্ছবি। তালা যত দিন ঝুলবে, ততদিন আগাছা শুধু কোর্টই ঢাকবে না, ঢেকে দেবে বঙ্গের কাবাডির ভবিষ্যতের স্বপ্নকেও। এখন দেখার, সেই তালা খোলার উদ্যোগ কত দ্রুত নেওয়া হয়। □

ঈশপের গল্প

মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না

এক গ্রামের এক রাখাল প্রতিদিন গোরু চরাতে এক মাঠে যেত। ছোটো বলে সবাই তাকে খুব ভালোবাসে। মাঠের পাশেই ছিল ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলে বাঘ থাকত। রাখাল খুব সাবধানে, চোখ কান খুলে গোরু চরায়।

এমনি করে বেশ দিন চলে যাচ্ছিল। একদিন তার একটু মজা করার ইচ্ছা জাগল। সে হঠাৎ 'বাঘ বাঘ, বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করতে শুরু করল।

কাছাকাছি লোকেরা যে যা হাতে পেল তাই নিয়ে ছুটে এল রাখালকে বাঁচাতে। তারা মাঠে এসে দেখে, কোথায় কী, দিব্যি মাঠে গোরু চরে বেড়াচ্ছে। আর রাখার মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হি হি করে হাসছে।

সবাই তো অপ্রস্তুত। তারা সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছে। ছোটো ছেলে বলে তারা বিশেষ কিছু বলল না। তবে এরকম কাজ যেন আর না করে বলে চলে গেল।

বেশ কিছুদিন পর আবার একদিন যখন প্রায় বেলা পড়ে এসেছে, তখন একই চিৎকার। লোকেরা আবার শশব্যস্ত হয়ে মাঠে ছুটে এল। দেখে, সেই একই কাণ্ড। রাখাল মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে হি হি করে হাসছে। এবার কিন্তু লোকেরা খুব রেগে গেল। সবাই মিলে আচ্ছা করে বকুনি দিল রাখালকে। রাখালও দেখল, সবাই রেগে গেছে, তখন দু'কান ধরে বলল— আর কোনোদিন সে এরকম করবে না।

আবার বেশ কিছুদিন গেল। এবার সত্যিই বাঘ এসে রাখালের গোরুর পালের উপর ঝাঁফিয়ে পড়ল। রাখাল প্রাণভয়ে চিৎকার করতে লাগল— বাঁচাও, বাঁচাও, বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে। সবাই তা শুনতে পেল। কিন্তু কেউ আর সেদিন নিজেদের কাজ ফেলে ছুটে এল না। সবাই ভাবল এবারও রাখাল মজা করছে।

এদিকে বাঘ পালের সবকটা গোরু মেরে ফেলে, রাখালকে আক্রমণ করল। সে প্রাণভয়ে কত চিৎকার করল, কিন্তু কেউ এল না। বেচারা তখন বুঝতে পারল, কেউ আর তাকে বিশ্বাস করে না। কিছু করার নেই। বেঘোরে তাকে মরতে হলো। মিথ্যে বলার সাংঘাতিক শাস্তি পেল রাখাল।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

মহাত্মা গান্ধী মেরিন

মহাত্মা গান্ধী মেরিন ন্যাশনাল পার্ক আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ওয়ান্ডুরের কাছে অবস্থিত। এখানে বিদ্যমান প্রবাল এবং সামুদ্রিক কচ্ছপের মতো প্রাণীর রক্ষার জন্য ১৯৭২ সালে এই উদ্যান তৈরি করা হয়েছে। এটি পোর্টব্লেয়ার থেকে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, দক্ষিণ আন্দামান ও রাটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমে অবস্থিত। উদ্যানটি ২২০ বর্গকিলোমিটার জলভাগ এবং ৬১.৫ বর্গকিলোমিটার স্থলভাগ নিয়ে গঠিত। উদ্যানে ২০টি দ্বীপ রয়েছে। দ্বীপগুলি জনবসতিহীন। এই দ্বীপগুলির জলভাগে ২৮২ প্রজাতির মাছ-সহ মোলাস্ক, ক্রাস্টেশিয়ান, দৈত্যাকার ঝিনুক, সমুদ্র শশা, অ্যানিমোন ও তারামাছ রয়েছে। এর স্থলভাগে কুমির, নানা জাতের টিকিটিকি, সাপ , ডলফিন, বাদুড়, বুনো শুয়োর ও তাল খটাস রয়েছে। এছাড়া ২৭০ প্রজাতির পাখি রয়েছে।

এসো সংস্কৃত শিখি-১২০

भविष्यत्कालः – प्रथमपुरुषे (भागः–२)
पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च समानम्

छात्रः पठिष्यति। ছাত্রটি পড়বে।
एषः वैद्यः भविष्यति। এ ডাক্তার হবে।
एषा गीतं गास्यति। এ গান করবে। (স্ত্রী)
एषः चायं पास्यति। এ চা পান করবে।
काकलिः कवितां वदिष्यति।
কাকলি কবিতা বলবে।
सोमनाथः क्रीडाक्षेत्रे क्रीडिष्यति।
সোমনাথ খেলার মাঠে খেলবে।
मार्जारः दुग्धं पास्यति।
বেড়াল দুধ পান করবে।
(এভাবে ভবিষ্যৎকালে প্রথম পুরুষে একবচনে বাক্য রচনা করতে হবে)

ভালো কথা

ঠাকুমার পাখি

তিনদিন ধরে সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের ছাদে টিনের শেডের নীচে কাক, শালিক, পায়রা, ঘুঘু —কত পাখি এসে বসে থাকে। বৃষ্টির জন্য ওরা কোথাও খাবারের খোঁজে যেতে পারে না। ঠাকুমা বিস্কুট, চাল-ডাল মিশিয়ে ছাদে উঠে ছড়িয়ে দিতেই ওরা হুটোপুটি করে নেমে এসে খেতে শুরু করে। আমি ঠাকুমার পেছনে দাঁড়িয়ে দেখি। ঠাকুমা বলে, যে কদিন বৃষ্টি হবে, ওদের খেতে দিতে হবে। সব জলে থইথই করছে, ওরা খাবার পাবে কোথায়!

পাপিয়া অধিকারী, ষষ্ঠশ্রেণী, ধূপগুড়ি, মিলপাড়া, জলপাইগুড়ি

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

বর্ষা

সন্দীপ দাস, অষ্টমশ্রেণী, তপন, দঃ দিনাজপুর

ঝমঝমিয়ে পড়ছে বৃষ্টি
ভাসছে সবই জলে,
কৃষকভাইদের খুবই মজা
ধান রুইবে বলে।
বর্ষাকালে বৃষ্টি হবে
প্রকৃতির নিয়ম এটাই,
বৃষ্টির জন্য মন খারাপ
চলবে না তো ভাই!

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ✆ 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

পশ্চিমবঙ্গের নতুন জননিরাপত্তা আইন

সংবিধান, সমাজ, সুশাসনের হাতিয়ার ও জাতীয় ঐক্যের প্রেক্ষাপটে একটি পর্যালোচনা

ড. প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়

২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের পর নবগঠিত রাজ্য সরকার আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। সেই লক্ষ্যেই গত ২৯ জুন রাজ্য বিধানসভায় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জননিরাপত্তা সংক্রান্ত বিল পেশ করা হয়— 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফ্‌টি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, ২০২৬' এবং 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইন্টেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬'। এই দু'টি বিলকেই প্রধানত 'গুন্ডা দমন বিল' বা 'Anti-Goonda Bill' নামে অভিহিত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এদিন এই বিল দু'টি পেশ করেন। বিধানসভায় বিল দু'টির ওপর আলোচনা শেষে ভোটাভুটির পর বিল দু'টি পাশ হয়।

রাজনৈতিক আবেগের পরিবর্তে ভারতীয় সংবিধান, প্রশাসন, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং আইনশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দু'টি আইনের মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টায় আজ এই নিবন্ধের অবতারণা। প্রথমে আলোচনা করা যাক গুন্ডা দমন আইনের বিষয়ে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি প্রশ্ন বারবার ফিরে এসেছে— সরকার বা প্রশাসনের প্রথম দায়িত্ব কী? অধিকাংশ রাজনৈতিক দার্শনিকের মতে, সরকারের প্রধান কর্তব্য হল নাগরিকের জীবন, সম্পদ ও স্বাধীনতার সুরক্ষা। কোনো দেশে বা রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়লে অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেমে যায়, বিনিয়োগ কমে যায়, সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েন এবং গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই সভ্য সমাজে জননিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রশাসনকে কখনও কখনও কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হয়।

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী 'আইন-শৃঙ্খলা' রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গত কয়েক দশকে সংগঠিত অপরাধ, অবৈধভাবে জমি দখল, শিল্পাঞ্চলে চাঁদাবাজি, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায়, মাদক ব্যবসা, বেআইনি অস্ত্র পাচার, রাজনৈতিক হিংসা এবং সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গও এই সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। গত ৫০ বছর ব্যাপী বাম-তৃণমূল অপশাসনে এরাজ্যে এই সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা, নারী নির্যাতন, শিল্পাঞ্চলে তোলাবাজি, জমি দখল, সিন্ডিকেটরাজ, বেআইনি নির্মাণ, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর এবং বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ বহু বছর ধরেই পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছে। সাম্প্রতিককালে সিএএ ও ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলনের নামে ব্যাপক জেহাদি হিংসার সাক্ষী থেকেছে পশ্চিমবঙ্গ।

> **কয়েকজন দুষ্কৃতীর অপরাধের মূল্য পরিশোধ করেন কোটি কোটি নিরপরাধ নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে নতুন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সংস্কার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই আইনের উদ্দেশ্য হল সেই আর্থিক দায় প্রকৃত অপরাধীর উপর বর্তানো।**

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো মানুষের স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার এবং ভোটের ফলাফলকে শান্তিপূর্ণভাবে মেনে নেওয়া। কিন্তু যখন নির্বাচনের পর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, হামলা, বাড়ি ও দোকানঘরে অগ্নিসংযোগ, লুঠপাট, হত্যাকাণ্ড, নারী নির্যাতন কিংবা বিরোধী দলের কর্মীদের ঘরছাড়া হওয়ার অভিযোগ ওঠে, তখন গণতন্ত্রের প্রকৃত চেহারা প্রশ্নের মুখে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর যে ভয়াবহ ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা সামনে আসে, তা শুধু ভারতের নয়, আন্তর্জাতিক মহলেও আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। ২০২১-এ ফল ঘোষণার পর তৃণমূল কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। কিন্তু ফল প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, হামলা, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, নারী নির্যাতন এবং বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের এলাকা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হওয়ার অভিযোগ সামনে আসে। বিজেপি অভিযোগ করে যে তাদের বহু কর্মী ও সমর্থককে পরিকল্পিতভাবে টার্গেট করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অভিযোগ ওঠে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, নদীয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলী, কোচবিহার ও হাওড়া জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে। জগদ্দল, ভাটপাড়া, নৈহাটি, আমডাঙা, অশোকনগর, হাবড়া, গাইঘাটা এবং বসিরহাট মহকুমার বিভিন্ন

এলাকা থেকে হামলা, বাড়িঘর ভাঙচুর, দলীয় কার্যালয় দখল এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ ওঠে। বীরভূম জেলার রামপুরহাট, নলহাটি, সিউড়ি, দুবরাজপুর এবং আশপাশের এলাকায় সংঘর্ষের বহু অভিযোগ সামনে আসে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, কিছু এলাকায় বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, মারধর এবং সম্পত্তি ধ্বংসের অভিযোগ ওঠে। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল-সহ গোসাবা, ক্যানিং, বাসন্তী এবং কাকদ্বীপ অঞ্চলে রাজনৈতিক সংঘর্ষের পাশাপাশি নারী নির্যাতন ও বাড়িঘর ধ্বংসের অভিযোগও প্রকাশ্যে আসে। এই ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) তদন্ত করে। কলকাতা হাইকোর্টে কমিশনের পেশ করা রিপোর্টে এরাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করা হয়। প্রতিবেদনে হত্যা,নারী নির্যাতন, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগের উল্লেখ ছিল।

গত কয়েক বছরে রাজ্যের কিছু অঞ্চলে জেহাদি সন্ত্রাসের কারণে উত্তেজনা ও হিংসার একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। ২০২২ সালের হাওড়া, ২০২৩ সালের রিষড়া এবং ২০২৫ সালের মুর্শিদাবাদের ঘটনাগুলি পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষার বিষয়টিকে রীতিমতো প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এসব ঘটনায় নিরীহ হিন্দুদের প্রাণহানি, সম্পত্তির ক্ষতি, সাধারণ মানুষের বাস্তুচ্যুতি এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০২২ সালে শ্রীরামনবমীর শোভাযাত্রায় জেহাদি হামলার ঘটনায় হাওড়ার কয়েকটি এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। শুরুতে সীমিত পরিসরের সংঘর্ষ হলেও পরবর্তীতে তা একাধিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ, অগ্নিসংযোগ, দোকানপাটে ভাঙচুর এবং যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং কিছু এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। ২০২৩ সালে হুগলীর রিষড়া ও সংলগ্ন এলাকায় শ্রীরামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে আবারও জেহাদি আক্রমণের ঘটনা ঘটে। এমতাবস্থায় ফের উত্তেজনা দেখা দেয়। সংঘর্ষের ফলে বহু যানবাহন ও দোকানে আগুন লাগানো হয়, রেল চলাচল সাময়িকভাবে ব্যাহত হয় এবং বহু মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন কার্যকর হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলমানদের সশস্ত্র প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রথমদিকে অনেক প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ থাকলেও কয়েকটি স্থানে পরিস্থিতি দ্রুত হিংসাত্মক রূপ নেয়। জাতীয় সড়ক অবরোধ, পুলিশ ও সরকারি সম্পত্তির উপর হামলা, যানবাহনে অগ্নিসংযোগ, পাথর নিক্ষেপ এবং ট্রেন চলাচলে বিঘ্নের ঘটনা ঘটে। জেহাদি হিংসায় একাধিক ব্যক্তি নিহত হন এবং বহু মানুষ আহত হন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয় যে শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে মূলত হিন্দুরা ছিলেন, এবং কিছু এলাকায় অনেক হিন্দু পরিবার নিরাপত্তার অভাবে সাময়িকভাবে এলাকা ছেড়ে মালদহ, বিহার, ঝাড়খণ্ড-সহ অন্যত্র আশ্রয় নেন বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

নবনির্বাচিত সরকারের মতে, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরে শুধুমাত্র দণ্ডমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যথেষ্ট নয়; অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই দর্শনের ভিত্তিতেই নতুন জননিরাপত্তা বিল আনা হয়েছে। এই দুটি আইনের লক্ষ্য এক নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফ্‌টি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ অ্যাক্ট, ২০২৬'— মূলত সম্ভাব্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য জেলা প্রশাসনকে প্রতিরোধমূলক ক্ষমতা প্রদান করে। 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইন্টেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট, ১৯৭২'-এ সংশোধনীর মাধ্যমে আইনটিকে সময়োপযোগী করে তুলেছে নবনির্বাচিত রাজ্য সরকার। 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইন্টেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০২৬'—জন-অশান্তি, বিক্ষোভ বা হিংসার সময় সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি হলে তার জন্য দায়ীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করে।

এই আইনের প্রথম অংশটির সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন বা প্রতিরোধমূলক আটক। সাধারণত কোনো ব্যক্তি অপরাধ করার পরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। আইনি বিধান অনুযায়ী--- প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন-এর ক্ষেত্রে প্রশাসন যদি বিশ্বাস করে যে কোনো ব্যক্তি জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুতর বিপদ সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তাকে আটক করা যাবে। এই আইন অনুযায়ী— জেলাশাসক (ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট) অথবা পুলিশ কমিশনার এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আটকাদেশ জারি করতে পারেন, যাকে 'ডেস্পারেট' ও 'ডেঞ্জারাস' অর্থাৎ সমাজের জন্য বিপজ্জনক বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মনে করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জারি করা প্রাথমিক আটকাদেশ অনুযায়ী একজন অপরাধীকে ১৫ দিনের জন্য প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন বা প্রতিরোধমূলক আটক করা যায়। ওই ব্যক্তিকে ১৫ দিন পরও আটকে রাখার জন্য রাজ্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। পুলিশ রিপোর্ট খতিয়ে দেখে রাজ্য সরকার অনুমোদন দিলে তিন মাসের আটকাদেশ কার্যকর থাকে; এরপর তা বহাল রাখতে হলে হাইকোর্টে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও আইন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত তিন সদস্যের 'অ্যাডভাইসরি বোর্ড' বা 'উপদেষ্টা পর্ষদ'-এর অনুমোদন প্রয়োজন। অ্যাডভাইসরি বোর্ড-এর কাছে বিষয়টি উপস্থাপিত হলে এ বিষয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে বোর্ডকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আইন অনুযায়ী, একজন ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ এক বছর (১২ মাস) পর্যন্ত বিচার ছাড়াই আটক করে রাখা যেতে পারে, যদি আইনসম্মত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। এখানেই বিরোধীরা একটি বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।

সরকারপক্ষের মতে এর ফলে বিপজ্জনক অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে, সাক্ষীদের ভয় দেখানো কমবে, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে পারবে। আবার এর সমালোচকদের মতে বিচার ছাড়া দীর্ঘদিন আটক রাখা ব্যক্তিস্বাধীনতায় আঘাত; প্রশাসনিক ভুল বা আইনের অপব্যবহারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ধরনের আইনের অপব্যবহারের আশঙ্কা সর্বদা থাকে। এর বিপরীত যুক্তি হিসেবে এই আইনে বলা হয়েছে যে, আটক ব্যক্তিকে পাঁচ দিনের মধ্যে তার আটক হওয়ার কারণ জানিয়ে দিতে হবে। তবে যদি সরকার মনে করে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করলে জননিরাপত্তা বা জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, তাহলে কিছু তথ্য গোপন রাখা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, যদি কোনও ব্যক্তিকে ১৫ দিনের বেশি আটক রাখতে হয়, তাহলে বিষয়টির অনুমোদন গ্রহণের

জন্য একটি ‘অ্যাডভাইসরি বোর্ড’-এর সামনে উপস্থাপন করতে হবে। তিন সদস্যের এই বোর্ডের চেয়ারপার্সন হবেন উচ্চ আদালতে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং অন্য দুই সদস্যও উচ্চ আদালতের বিচারপতি হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি বা আইন বিশারদ হবেন। বোর্ড যদি মনে করে আটক অযৌক্তিক, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে হবে। এটি প্রশাসনিক ক্ষমতার উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ।

তবে এই আইনের অন্যতম ধারা হলো— অ্যাডভাইসরি বোর্ড-এর সামনে আটক ব্যক্তি সাধারণভাবে আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না; ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে লিখিত কারণ উল্লেখ করে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এই বিধান নিয়ে তথাকথিত মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা বিতর্ক সৃষ্টি করছে। তাদের মতে, আইনি সহায়তার সুযোগ সীমিত হলে ন্যায়বিচারের ধারণা দুর্বল হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, প্রতিরোধমূলক আটক সাধারণ ফৌজদারি বিচারের সমতুল নয় এবং সংবিধানও এই ধরনের বিশেষ প্রক্রিয়ার সুযোগ রেখেছে। আইনে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিধান হলো— Externment Clause বা নির্বাসন আদেশ সংক্রান্ত আইনি ধারা। এর মাধ্যমে কোনো আটক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট এলাকায় এক বছর পর্যন্ত পুনঃপ্রবেশ থেকে বিরত রাখা যেতে পারে, যাতে সংবেদনশীল এলাকায় পুনরায় অশান্তি সৃষ্টি না হয়।

এখন ভারতীয় সংবিধানের আলোকে এই আইনের মূল্যায়ন করা যাক। কোনো গণতান্ত্রিক দেশে আইন প্রণয়নের মূল ভিত্তি হলো— ‘সংবিধান’। জননিরাপত্তা রক্ষা যেমন সরকারের দায়িত্ব, তেমনি নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষাও সরকারের সমান দায়িত্ব। তাই এই দু’টি আইনের মূল্যায়ন করতে হলে ভারতীয় সংবিধানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদের আলোকে বিচার করা প্রয়োজন। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। নতুন আইনের প্রয়োগে যদি কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাহলে তা অনুচ্ছেদ ১৪-র পরিপন্থী হবে। অতএব, প্রশাসনের দায়িত্ব হবে আইনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা। ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনও ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা আইনসম্মত প্রক্রিয়া ব্যতীত কেড়ে নেওয়া যায় না। প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন-এর ক্ষেত্রে তাই প্রশাসনের প্রতিটি সিদ্ধান্তকে আইনসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত হতে হবে। ভারতীয় সংবিধান প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন-এর ধারণাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেনি। ভারতীয় সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদ ভারতীয় নাগরিকদের অ-আইনানুগ গ্রেপ্তার ও আটক থেকে সুরক্ষার মৌলিক অধিকার প্রদান করে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের কারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার, আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়ার এবং গ্রেপ্তারির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হওয়ার অধিকার প্রদান করে এই অনুচ্ছেদ। যদিও প্রতিরোধমূলক আটকের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদ-প্রদত্ত এই অধিকারগুলির ব্যতিক্রম রয়েছে। এই অনুচ্ছেদটি প্রধানত দু’টি অংশে বিভক্ত— (১) সাধারণ আইনের অধীনে নির্দিষ্ট সাংবিধানিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং (২) প্রতিরোধমূলক আটকের বিধান। ভারতীয় সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদের ৪ নং ধারা অনুযায়ী— উপদেষ্টা পর্ষদের অনুমোদন ছাড়া প্রতিরোধমূলক হেফাজতে থাকা কোনো ব্যক্তিকে তিন মাসের বেশি আটকে রাখা যায় না। এরাজ্যে প্রণীত নতুন আইনে অ্যাডভাইসরি বোর্ড-এর মাধ্যমে তিন মাসের বেশি আটক রাখার আগে বিচারবিভাগীয় পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা সংবিধানের এই ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অনেকেই মনে করেন প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম চালু হয়েছে। বাস্তবে তা নয়। ভারতে বহুদিন ধরেই বিভিন্ন আইনে এই ব্যবস্থা বিদ্যমান। যেমন— The National Security Act (NSA), 1980; The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974; The Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980। অতএব, পশ্চিমবঙ্গের নতুন আইন ভারতীয় আইনি ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম নয়; বরং বিদ্যমান প্রতিরোধমূলক আইনগুলির একটি রাজ্যভিত্তিক রূপ।

এবার পর্যালোচনা করা যাক রাজ্য বিধানসভায় প্রণীত দ্বিতীয় আইনটির বিষয়ে, যা হলো— ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইন্টেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০২৬’ বা জনসম্পত্তি ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইন। দ্বিতীয় আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো— যদি কেউ জন-অশান্তির সময় সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন, দাঙ্গা বা হিংসাত্মক ঘটনার সময় বাস, ট্রেন, রেল স্টেশন, রেল লাইন, সরকারি অফিস, আদালত, ব্যাংক, ডাকঘর, হাসপাতাল, স্কুল, সেতু কিংবা বিদ্যুৎ পরিকাঠামো ভাঙচুরের সময় কোটি কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়। এই ক্ষতিপূরণের টাকা আসে সরকারের কোষাগার থেকে। এর আর্থিক বোঝা শেষ পর্যন্ত বহন করেন দেশের সাধারণ করদাতারা। অর্থাৎ কয়েকজন দুষ্কৃতীর অপরাধের মূল্য পরিশোধ করেন কোটি কোটি নিরপরাধ নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে নতুন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সংস্কার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই আইনের উদ্দেশ্য হল সেই আর্থিক দায় প্রকৃত অপরাধীর উপর বর্তানো।

এই আইন কার্যকর হওয়ার জন্য কেবল কঠোর ধারা থাকাই যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন— নিরপেক্ষ পুলিশ প্রশাসন, দ্রুত বিচার, ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের প্রতি রাজ্য সরকারের অবিচল শ্রদ্ধা, প্রযুক্তিনির্ভর তদন্ত, সিসিটিভি ফুটেজ ও ডিজিটাল প্রমাণ, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত তদন্ত, নিয়মিত বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা। সরকারকে মনে রাখতে হবে যে, জননিরাপত্তা ও নাগরিক স্বাধীনতা— দু’টিই একটি সুস্থ গণতন্ত্রের অপরিহার্য ভিত্তি। এই দুইয়ের মধ্যে সুবিবেচিত ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলেই নতুন আইনগুলি পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা আনয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। পরিশেষে বলা যায়, একই আইন এক সরকারের হাতে জনকল্যাণের উপকরণ হতে পারে, আবার অন্য সরকারের হাতে নাগরিক স্বাধীনতার জন্য উদ্বেগের কারণও হতেপারে। আইন যতই কঠোর হোক, তার প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে ন্যায়সঙ্গত, স্বচ্ছ ও বৈষম্যহীন প্রয়োগে। সেই আদর্শই হওয়া উচিত পশ্চিমবঙ্গের নতুন জননিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

(লেখক বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজের ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ)

‘অভিন্ন দেওয়ানি বিধি’
পশ্চিমবঙ্গে এখনই প্রণয়ন প্রয়োজন

সারা দেশে ‘ইউনিফর্ম সিভিল কোড’ বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বলবৎ হওয়া জরুরি হলেও পশ্চিমবঙ্গে এখনই এই বিধি প্রণয়ন দরকার। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে গত ১৫০ বছরের ভারতের ইতিহাসের পর্যালোচনা প্রয়োজন।

১৭৫৭-র পর থেকে ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের শাসন কায়েম করে। ৯০ বছর রাজত্ব ও লুঠতরাজ করে তারা একটা ব্যাপার বুঝতে পারে না যে কেন এদেশের সব মানুষ, অর্থাৎ হিন্দুরা ৭০০ বছর ইসলামি শাসনের পরও সকলে মুসলমান হলো না? বিশ্বের কোনো দেশে ইসলামি শাসন কায়েম হওয়ার ২৫ বছর পর যেখানে সেদেশের অধিবাসীরা তাঁদের উপাসনা পদ্ধতি ধরে রাখতে পারেনি। ৭০০ বছর ধরে ইসলামি শাসনের পরও কেন এদেশের মানুষ হিন্দু কলেজে না পড়ে টোল, চতুষ্পাঠী বা সংস্কৃত কলেজে যাচ্ছে? কেন এদেশের মানুষ ইংরেজদের ফিরিঙ্গি বা প্রায় অচ্ছুত বলে মনে করছে। তাঁদের এই আত্মমর্যাদার উৎস কী? কোথা থেকে এই জাতি পাচ্ছে এত আত্মবিশ্বাস?

১৮২৮ সালে ‘ব্রাহ্মসমাজ’ প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৩৫ সালে টমাস ব্যাবিংটন মেকলে প্রস্তুত করেন ‘মেকলেজ্ মিনিট’, যা ছিল ভারতবর্ষে ইংরেজদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রথম ‘কলোনিয়াল পলিসি ডকুমেন্ট’ (এই একই ব্যক্তি ১৮৩৭ সালে রচনা করেন ‘ইন্ডিয়ান পেনাল কোড’ যা ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ-ভারতে প্রণীত হয়)। কিন্তু ভারতের বৃহত্তর হিন্দুসমাজকে ভাঙার কাজ এগোচ্ছে না। দীর্ঘমেয়াদে ভারতকে শাসন করতে ভারতীয় সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙা প্রয়োজন। দিল্লির মুঘল শাসক বা আঞ্চলিক স্তরের মুসলমান শাসক ও নবাবরা বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু রাজা ও জমিদারদের নিজেদের জায়গায় রেখে দেয়। তাহলে কী করা যায়? দরকার এমন কিছু আইন যা হিন্দু রাজা-রানিদের হাত থেকে তাঁদের

রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে সহায়ক হবে। এরই সঙ্গে হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ও খ্রিস্টমত গ্রহণের প্রবণতাও বেড়ে যাবে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বড়লাট ডালহৌসি দু’টি ঔপনিবেশিক আইন আনলেন— (১) দ্য কাস্ট ডিজেবিলিটিজ্ রিমুভাল অ্যাক্ট, ১৮৫০ এবং (২) ‘দ্য ডক্ট্রিন অফ ল্যাপ্স্’ বা স্বত্ব-বিলোপ নীতি।

এতদিন হিন্দুসমাজে নিয়ম ছিল যে, কোনো ব্যক্তি যদি ধর্মান্তরিত হয়, তবে সে তার পৈতৃক সম্পত্তি পাবে না। প্রথম আইনটির বলে সেই বাধা উঠিয়ে দেওয়া হলো। এই ধরনের আইন এনে হিন্দুসমাজের পরম্পরাগত প্রথা, হিন্দু সম্পত্তি আইনকে খারিজ করা হলো যাতে এই বাধা আর না থাকে। বাড়তে থাকল ধর্মান্তরণ।

দ্বিতীয় আইনে বলা হলো— কোনো রাজার যদি পুত্রসন্তান না থাকে, তবে তাঁর রাজত্ব তাঁর রানি, তাঁর কন্যাসন্তান বা দত্তক নেওয়া পুত্র বা কন্যাকে দেওয়া যাবে না। অথচ হিন্দুসমাজে আগে রানি ও রাজকন্যাকে রাজত্বের উত্তরাধিকার দেওয়ার রীতি ছিল। মহাবিদ্রোহের ওপর ইতিহাসবিদ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের রচিত পুস্তক ‘The Sepoy Mutiny and The Revolt of 1857’-এর ৭ নম্বর পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতের আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়েও রানি ও রাজকন্যা যোগ্য হলে তাঁকে উত্তরাধিকারী হিসেবে রাজ্যদান করার বিধান রয়েছে। ‘চিত্রাঙ্গদা’ অন্যতম উদাহরণ। বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর মহারানি সত্যবতী বকলমে রাজত্ব চালান ভীষ্মকে সঙ্গে নিয়ে এবং তাঁর প্রথমপক্ষের পুত্র মহর্ষি ব্যাসদেবকে বংশরক্ষার আদেশও দেন। ঋগ্বেদের মণ্ডল ৬-এর ৭৫তম সূক্তের ১৩ ও ১৫তম শ্লোক— যোগ্য রানি ও রাজকুমারীকে মান্য করার জন্য ক্ষত্রিয়দের নির্দেশ দান করে।

‘দ্য ডক্ট্রিন অফ ল্যাপ্স্’ বা স্বত্ব-বিলোপ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে পাঁচ হাজার বছরের ভারতীয় রীতি-নীতি-নিয়ম ও পরম্পরাকে অগ্রাহ্য করে ছিনিয়ে নেওয়া হলো সাতারা (১৮৪৮), জয়পুর ও সম্বলপুর (১৮৪৯), ঝাঁসি (১৮৫৩) ও নাগপুর (১৮৫৪) রাজ্য। অত্যাচারী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুটছিল গোটা দেশ। দুরাচারী ইংরেজ শাসকদের তৈরি এই আইন যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে লেলিহান শিখায় রূপান্তরিত করতে অনুঘটকের কাজ করল। শুরু হলো ‘মহাবিদ্রোহ’। ভয়ংকরভাবে সেই বিদ্রোহকে দমন করল ইংরেজ শাসক। মহাবিদ্রোহের পর ভারতে জনগণনা শুরু করল ব্রিটিশরা। ১৮৭১-এর জনগণনা অনুযায়ী দেখা গেল এদেশে রয়েছে ৭৩ শতাংশ হিন্দু ও ২১ শতাংশ মুসলমান। ইংরেজ শাসকের পক্ষ থেকে শুরু হলো নতুন অঙ্ক। বিভিন্ন আইন প্রয়োগ করে তারা শুরু করল নতুন বন্ধু খোঁজার অঙ্ক।

মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ-ভারত সরকার শুরু করে জনগণনা। ১৮৬৫-তে জনগণনার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যা শেষ হয় ১৮৭১-এ। উপাসনা পদ্ধতি-ভিত্তিক জনগণনায় পাওয়া গেল উপরোক্ত তথ্য। এদেশের মধ্যে তাদের মিত্র অন্বেষণে ব্রিটিশরা এই তথ্যর ওপরে শুরু করল বিশ্লেষণ। তারা দেখল যে ইসলাম এদেশে বাইরে থেকে এসেছে, তার সঙ্গে খ্রিস্টানরাও। তাছাড়া মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা অনেক বেশি। বিচারের সময় শেষ মুঘল বাদশা বাহাদুর শাহ জাফর বলেন যে, তার ইচ্ছে ছিল না বিদ্রোহী হওয়ার। কিন্তু তার কেল্লায় সিপাহিরা জোর করে ঢুকে পড়ে। এখান থেকেই শুরু হলো বিভিন্ন হিন্দু আইনে কাটাছেঁড়ার খেলা। ১৮৭২ সালে পাশ হলো

'স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট', যাতে হিন্দুদের সঙ্গে অন্যদের বিয়ের ব্যাপারে কোনো বাধা না থাকে। এর আগে ১৮৫০-এর 'দ্য কাস্ট ডিজেবিলিটিজ্ রিমুভাল অ্যাক্ট' অন্য উপাসনা পদ্ধতিতে বিশ্বাসীদের বিবাহ করলেও সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়ার রাস্তা তো খুলে রেখেছিল। এইসব আইন-কানুনের প্রভাবে বিবাহ শুরু হলো হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মধ্যে। মুসলমানদের তো তাদের মজহবি মতে নিকা হয়। তাদের ওপরে এইসব আইন কার্যকর হলো না। ১৮৭৪ থেকে ২০১১— ভারতে হিন্দুদের সংখ্যা বাড়ে প্রায় ৫ গুণ, যেখানে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেড়েছে ৩১ গুণ। ওদিকে মুসলমানদের ইসলাম অর্থাৎ শরিয়ত অনুযায়ী চলার সব ব্যবস্থা করে ব্রিটিশ-ভারত সরকার। ১৯০৬-এ বড়লাট মিন্টো সিমলায় ৩৫ জন মুসলমান নেতাকে নিয়ে বৈঠক করে তাদের দাবিদাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহ দেয় এবং এই বৈঠকের দু'মাসের মধ্যে ঢাকায় তৈরি হয়— 'মুসলিম লিগ'। ১৯৩৭-এ নির্বাচনের পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক আইনসভা তৈরি হলে ব্রিটিশ বোঝে যে এই দেশে তাদের শাসন আর দীর্ঘস্থায়ী হবে না, তখন আনা হয়— ''দ্য মুসলিম পার্সোনাল ল' (শরিয়ত) অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট, ১৯৩৭''। মুসলমানদের বিবাহ, উত্তরাধিকার, পুত্র ও কন্যা সন্তান দত্তক গ্রহণ এবং জমি সংক্রান্ত সব বিবাদের জন্য পৃথক আইন ব্যবস্থা ও আদালত থাকবে, যা কোরান, হাদিস ও শরিয়ত অনুসারে চলবে। অন্যদিকে জওহরলাল নেহরু ও মোহনদাস গান্ধীর খুব কাছের লোক বিএন রাওকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দায়িত্ব দেওয়া হলো 'হিন্দু কোড বিল' তৈরি করতে। হিন্দুদের সবকিছুর ক্ষেত্রে কিন্তু বিচার হবে দেশের আদালতে। হিন্দু আইনগুলিকে কোডিফাই করার লক্ষ্যে 'হিন্দু কোড বিল' তৈরিতে জোর দেওয়া হলো হিন্দু রীতিকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রেখে। কিন্তু এর মধ্যে শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধ শেষ হলে ভারতের সংবিধান সভায় আবার পেশ হলো 'হিন্দু কোড বিল'। একই দেশে হিন্দু-মুসলমানের জন্য পৃথক আইন চালু হলো। যদিও ভারতীয় সংবিধানে 'নির্দেশমূলক নীতি' অংশে (৪৪ নং অনুচ্ছেদে) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতি দেশে ও প্রতিটি রাজ্যে 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' প্রণয়নে গুরুত্ব আরোপের বিষয়ে সাংবিধানিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৭-এর আগে দেশের হিন্দুদের জনসংখ্যা কমে হয় ৬৪ শতাংশ। দেশভাগ হলো। এরপর ধীরে ধীরে দেশে হিন্দুদের জনসংখ্যা বেড়ে হলো ৮৫ শতাংশ।

দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষ যখন হিন্দু এবং মুসলমানদের জন্য দু'টি আলাদা দেশ দেওয়া হয়েছে, তাহলে এদেশে জাতি-বর্ণ-উপাসনা পদ্ধতি নির্বিশেষে সকলের জন্য কেন একটা সাধারণ (কমন) সিভিল আইন নয়? একই দেশে হিন্দুর আইন, মুসলমানের আইন তো চলতে পারে না। উপাসনা পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে দেশের নাগরিকরা পৃথক দেওয়ানি বিধি দ্বারা শাসিত হবে কেন? ফৌজদারি আইন তো সকলের জন্যই সমান। সেক্ষেত্রে মুসলমানরা শরিয়তি আইন অনুযায়ী ফৌজদারি বিধি দাবি করে না কেন বা 'বহুত্ববাদের দেশ'-এর বুলি আওড়ানো সিউডো-সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলি মুসলমানদের হয়ে সেই সওয়াল করে না কেন? স্বাধীন দেশে অখণ্ড জাতি গঠনের লক্ষ্যে সার্বভৌম, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নে বাধা কোথায়? বিবিধতার মধ্যে থেকে একতায় পৌঁছনোর অভিযাত্রায় দীর্ঘ সরণী বেয়ে দেশ তো চলেছে গত ৮০ বছর ধরে। ৮৫ শতাংশ ভারতীয় নাগরিকদের জন্য এক ধরনের আইন-কানুন আর বাকিদের জন্য সেই আলাদা আদালত এবং আলাদা আইনি ব্যবস্থা? মুসলমান ভোটব্যাংকের রাজনীতিতে সওয়ার হওয়া ভোটভিখারি, সিউডো-সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলির বিভাজনের রাজনীতি এদেশের পক্ষে যেন এক ভয়াবহ অভিশাপ! ভারত শাসনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রবর্তিত 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'-এর পরিবর্তে এই সিউডো-সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলি চালু করে— 'রুল অ্যান্ড ডিভাইড' প্রথা। আজকের এই ভবিষ্যৎটাকে অনেক আগে অনুধাবন করে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-সহ বহু দেশবরেণ্য নেতৃত্ব। সংবিধান সভায় জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের এই কার্যকলাপের প্রতিবাদ করল হিন্দু মহাসভা। ডঃ বিআর আম্বেদকর পদত্যাগ করলেন। নেহরু দেখলেন ভোটের আগে এই নিয়ে ঝামেলা করলে হিন্দুরা বেঁকে বসবে। ১৯৫১-৫২-র নির্বাতনে কংগ্রেস দেশে ক্ষমতাসীন হলে নেহরু ঝুলি থেকে বেড়াল বের করলেন। স্বাধীনতার পরও যাতে 'ধর্মান্তরণ' আগের মতো অব্যাহত রাখা যায়, সেই লক্ষ্যে ভারতীয় সংসদে একটা হিন্দু কোড ভেঙে চারটি আলাদা বিল এল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু মহিলার জীবনে নেমে এলো অন্ধকারতম দিন। ধর্মেন্দ্র, মহেশ ভাট, কবির সুমন-সহ অংসখ্য লোক তাদের স্ত্রীকে ঠকিয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রী এবং তাঁদের সন্তানরা রাস্তায় গিয়ে বসল, যেহেতু— স্বামী তাঁর সম্পত্তি-সহ চলে গিয়েছে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে; স্বামী তার সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে প্রথম স্ত্রী ও তাঁর সন্তানদের। মুসলমানদের জনসংখ্যা ফের বাড়তে লাগল স্বাধীনতার পর। সবচেয়ে বেশি মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটল পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও কেরালায়। কারণ অপদার্থ কংগ্রেসি ও বামপন্থী শাসকদের কাছে মুসলমান ভোটব্যাংক থাকলে তাদের যাবতীয় অপদার্থতা ঢাকা পড়ে। এই ভোটব্যাংকের জোরে তারা বার বার নির্বাচিত হয়। কেরালায় আজ হিন্দুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই। পশ্চিমবঙ্গও 'কাশ্মীর'-এ পরিণত হওয়ার আগে এরাজ্যকে বাঁচাতে সারা বিশ্বের বাঙ্গালি এক হয় এবছরের মার্চ-এপ্রিল মাসে। গোটা বিশ্বের মধ্যে 'পশ্চিমবঙ্গ' হলো হিন্দু বাঙ্গালির একমাত্র ভূমি। এই হোমল্যান্ডকে আমরা কিছুতেই হারাবো না, কিছুতেই জেহাদিদের কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করব না— এটাই ছিল পশ্চিমবঙ্গবাসীদের একমাত্র দাবি। আর সেই দাবি মেনেই পশ্চিমবঙ্গে প্রণীত হবে— 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি'। জনজাতি সমাজের স্বকীয়তা বজায় রেখে রাজ্য বিধানসভায় প্রণয়ন করতে হবে এই আইন। গোটা ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আগামীদিনে প্রণীত হতে পারে। কিন্তু রাজ্য বিধানসভায় পাশের পর এরাজ্যে সিভিল কোড মানতে হবে মুসলমানদের। কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের মদতে গত ৮০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বিপজ্জনকভাবে বেড়েই চলেছে মুসলমান জনসংখ্যা। সীমান্তবর্তী জেলাগুলির ডেমোগ্রাফি পাল্টে দেওয়া হয়েছে। আর ১ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা বাড়তে দেওয়া যাবে না আগামী ১০০ বছরে। কারণ এই ভূমি হলো হিন্দু বাঙ্গালিদের। জনসংখ্যাগত ভারসাম্য পরিবর্তনের জন্যই ১৯৪৭-এ রক্তাক্ত বঙ্গবিভাজনের সাক্ষী থেকেছে বাঙ্গালি। এরাজ্যের সার্বিক সুরক্ষার লক্ষ্যে অবিলম্বে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন প্রয়োজন। □

বারুইপুর এনকাউন্টার : ভরসা ইন, ভয় আউট

বিশ্বপ্রিয় দাস

বারুইপুর নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সত্যিসত্যি পথে নামলেন? যিনি পার্কস্ট্রিট থেকে কামদুনি পর্যন্ত সমস্ত কাণ্ডকে নানা অছিলায় হয় এড়িয়ে গেছেন, নয়তো নানা কুৎসা দিয়ে অথবা পয়সা দিয়ে রফা করতে গেছেন। তাঁর এজেন্টরা তামান্নার মা থেকে বগটুই ছুটে গেছেন রফা সূত্র নিয়ে। তিনি ছিলেন পুলিশমন্ত্রী। অভয়া কাণ্ডের সময় তাঁর ও তাঁর দলের কর্মকর্তাদের গতিবিধি এখন আর কারোর অজানা নয়। বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকার কঠোর মনোভাব নিয়েছে, সেই সময়ে তিনি পথে নেমেছেন নাটক করতে। তিনি ভুলে গেছেন, যখন সবে তিনি রাজনীতির জগতের শৈশবে। সেই সময়ে চম্পলা সরদারের চরিত্রের দোষ খুঁজতে দ্বিধা করেননি। যেমনটা তিনি বলে থাকেন। তাঁর পরোক্ষ মদতদাতা কংগ্রেস ও সিপিএম। তাঁরা আবার বর্তমান রাজ্য সরকারের এই কঠোর অবস্থানের সমালোচনা করছে।

বারুইপুরে ঘটনার পর পরই রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দলের পক্ষ থেকে সামাজিক মাধ্যমে বর্তমান শাসক দলের যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা চলছিল। বাস্তবে দেখা যায় যে এই সামাজিক মাধ্যমেই বর্তমান শাসক দলের এক কর্মী ধরে নিয়ে আসছেন মূল অভিযুক্তকে। আরও খোঁজ করতে গিয়ে জানা যায়, অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে গত বিধানসভা নির্বাচনে বুথের দায়িত্বে থাকা সিপিএমের এক কর্মীও। একটি সূত্র বলছে এখনো রয়েছে হার্মাদ বাহিনী। যারা হত্যা, নারী পাচার থেকে শুরু করে নানা কাজ পেশাদারিভাবে করে বেড়ায়। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যারা এই এলাকায় ভোট কর্মী হিসেবে গিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে ভীষণ ভয়ংকর, সেটা ভাষায় বোঝানো যাবে না। ফলে রাজ্যের সম্প্রতি প্রাক্তন হওয়া মুখ্যমন্ত্রী যতই সবুজ মোমবাতি নিয়ে রাস্তায় নামুন, যতই নারী লাঞ্ছনার জন্য কুম্ভীরাশ্রু ফেলুন, রাজ্যের সাধারণ মানুষ যে আর তাঁকে পাত্তা দেবেন না, সেটা তিনি বুঝেই গেছেন। তাই তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলে নিজের দলের এক কর্মীর গালে সপাটে চড় মারতেও দ্বিধা করেন না। যে কর্মীরা তাঁকে ঈশ্বরী আসনে বসিয়েছেন সেই রকম এক অনুগত কর্মীকে তিনি জনসমক্ষে চড় মেরে এটাই প্রমাণ করলেন যে, তিনি কতটা স্বার্থান্বেষী।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনীতির ক্ষেত্রে সূর্যপুর, ন্যাতরা, মগরাহাট, লক্ষ্মীপুর সমেত এই এলাকার দুর্নাম চিরকাল। কী বাম আমলে, কী তৃণমূলের আমলে কুখ্যাত সমাজ বিরোধীদের আস্তানা এই জায়গাগুলি। ডাকাতদের গ্রাম বলে পরিচিত ছিল এই গ্রামগুলি। শোনা যায় সূর্যপুর রেলস্টেশনে কোনো রেল কর্মী থাকতেন না, এলাকায় ভয়ে যেতে চাইতেন না কোনো পুলিশ কর্মী। এই এলাকায় ডায়মন্ড হারবারগামী ট্রেন গেলে ছিনতাই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। শুধু তাই নয়, রাজ্যের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরাজ চালাত এই এলাকার দুর্বৃত্তরা। এদের ব্যবহার করেছে বামেরা ও তৃণমূল। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যারা ভোট নিতে গিয়েছিলেন, সেই ভোটকর্মীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বোমা ও পিস্তলের ডগায় ছাপ্পা ভোটের। এই সব এলাকা নিয়ে এক সময়ে প্রচলিত ছিল একটি প্রবাদ যে, এই এলাকায় কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে চাইত না। এও জানা গেছে যে এই এলাকার দুষ্কৃতীরা ভোটে সন্ত্রাস করতে চলে যেত রাজ্যের বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রে। এক সময়ে বামেদের হয়ে, পরবর্তীতে তৃণমূলের হয়ে। এই প্রতিবেদক এই এলাকার দুর্বৃত্ত দেখেছেন মেদিনীপুরে, কলকাতায়, পুরুলিয়া থেকে বীরভূমে। চষে বেড়াত সদর্পে। সেই কারণেই এদের লাগামছাড়া বাড়বাড়ন্ত চলত বছরের পর বছর। এখানে কোনো বিশেষ সম্প্রদায় নয়, এদের একটাই পরিচয়, স্থানীয় ভাবে ডাকাত, রেললাইনে ছিনতাইবাজ। আর রাজনীতির ময়দানে সৈনিক। ডাকাতরাজ, গুন্ডারাজের সূতিকাগার হয়ে উঠেছে দিনের পর দিন। নারী পাচার চক্র, বেআইনি অস্ত্রপাচার চক্র, মাদকচক্র সমেত নানা বেআইনি কাজের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই বিশেষ অঞ্চলগুলি। এই অঞ্চলের পুলিশ এই সব দুষ্কৃতীদের গায়ে হাত দিতেও ভয় পেত। এখানে ছিল না কোনো আইনের শাসন। এখন নতুন বিজেপি সরকার এসেছে। দুষ্কৃতীদের মৌরসীপাট্টার দিন শেষ। সেটা প্রমাণিত হলো বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় বর্তমান বিজেপি সরকারের কঠোর হাতে দমন প্রক্রিয়ায়। যেখানে মূল দুষ্কৃতীকে এনকাউন্টার করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, বাড়াবাড়ি করলে এটাই হবে ভাগ্যলিখন। রাজ্যের বাম, কংগ্রেস, প্রাক্তন শাসকদলের কাছে এটা একেবারেই ঠিক হলো না। কেননা এবার যে আইন রক্ষা করবে মানুষকে, শাসক ভরসা দেবে নিরাপত্তার, সাধারণ মানুষ প্রত্যুত্তরে জানাবে শাসকের প্রতি নিজেদের ভালোবাসার কথা, সহযোগিতার কথা। পারস্পরিক মেলবন্ধনেই এগিয়ে চলবে নতুন সরকার।

বারুইপুরের সত্য : লাহেক আলির গ্রেপ্তার ও কমরেডদের খসে পড়া মুখোশ

বিপ্লব বিকাশ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা চেনা ফর্মুলা আছে— কোনো অপরাধ ঘটলে আগে অপরাধীর ধর্ম আর রাজনৈতিক পরিচয় মাপো, তারপর প্রতিবাদের ভাষা ঠিক করো অর্থাৎ সিলেক্টিভ প্রতিবাদ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুরের সাম্প্রতিক নৃশংস ঘটনাটি এবং তাঁর পরবর্তী ঘটনাক্রম বামপন্থীদের এই মজ্জাগত ও কুৎসিত চালচিত্রকে আরও একবার প্রকাশ্য দিবালোকে টেনে এনেছে। প্রগতিশীলতার চাদর গায়ে জড়ানো কমরেডরা কীভাবে সত্যকে আড়াল করতে এবং সমাজকে বিভ্রান্ত করতে নিজেদের গোটা ইকোসিস্টেম নামিয়ে দেয়, তা এখন জলের মতো পরিষ্কার।

বারুইপুরে একটি নাবালিকা মেয়ের নির্মম ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু থেকেই নোংরা রাজনীতিতে মেতেছিল বামেরা। স্থানীয় বিজেপি নেতা শান্তনু মণ্ডল যখন গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে ডোবা থেকে মেয়েটির মৃতদেহ উদ্ধার করতে যান, তখন গণরোষের মুখে পড়ে গণপিটুনিতে এক সন্দেহভাজনের মৃত্যু হয়। এরপরই সুযোগসন্ধানী বামপন্থী আইটি সেল এবং তাদের তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবীরা সমস্বরে চিৎকার শুরু করেন যে, এই নৃশংসতার পেছনে নাকি আরএসএস বা বিজেপির যোগসূত্র রয়েছে। লক্ষ্য ছিল একটাই— সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে ঘুরিয়ে দেওয়া।

কিন্তু সত্যকে কি আর মিথ্যার চাদরে চিরকাল ঢেকে রাখা যায়? পুলিশি তদন্ত এগোতেই দেখা গেল, এই ঘটনায় সরাসরি হিংসা ছড়ানো এবং উসকানি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে প্রভাবশালী বামপন্থী নেতা মহম্মদ লাহেক আলি। শুধু তাই নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় ফর্মের সিগনেচার-সহ নথিপত্র দিয়ে মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, এই ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার আসলে সিপিএমেরই একজন সক্রিয় বুথ এজেন্ট ছিল। অর্থাৎ নিজেদের লোক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত, অথচ দোষ চাপানো হচ্ছিল অন্যের ঘাড়ে।

সবচেয়ে বড়ো চাবুকটা মেরেছে খোদ নিয়তি। এই ঘটনায় যার পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত্যু হলো, সেই প্রভাস মণ্ডলের মা ও স্ত্রী ঘৃণা আর লজ্জায় তার মৃতদেহ পর্যন্ত নিতে অস্বীকার করলেন। যে কুখ্যাত অপরাধীকে তার নিজের পরিবার কুলাঙ্গার বলে পরিত্যাগ করল, আলিমুদ্দিনের কমরেড বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য তাকেই আবার 'ভদ্রলোক'-এর সার্টিফিকেট দিলেন! অন্যদিকে, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছেন সেই অপরাধীর এনকাউন্টারে মৃত্যুর বিরোধিতা করতে। ভাবা যায়, ছিঃ! এটাই হলো কমিউনিস্টদের প্রকৃত চরিত্র

তোষণের রাজনীতি করতে কমিউনিস্ট নীরব থাকে, অথচ বারুইপুরে নিজেদের দলের এজেন্টের কুকীর্তি ঢাকতে এবং উসকানিদাতা নেতা লাহেক আলিকে বাঁচাতে তারা মিথ্যা ন্যারেটিভ তৈরি করে রাজ্যকে অস্থির করতে চায়। এই রাজ্যে যখনই কোনো নারী লাঞ্ছিতা হয়েছেন, বামপন্থীরা বরাবরই অপরাধীকে আড়াল করতে ব্যস্ত হয়েছে। ১৯৯০ সালের বানতলা গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা কিংবা ১৯৯২ সালের ধানতলার নারকীয় অত্যাচারের কথা সবার মনে আছে। জঘন্যতম সেই অপরাধের পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিধানসভায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অসংবেদনশীলভাবে মন্তব্য করেছিলেন, 'এমন ঘটনা তো ঘটেই থাকে, এটা নতুন কিছু নয়।' ধর্ষণের মতো অপরাধকে 'স্বাভাবিক' বলে দেগে দেওয়ার এই যে প্রাতিষ্ঠানিক মানসিকতা, সেটাই আজ বারুইপুরে অন্য রূপ নিয়ে ফিরে এসেছে। ভাবতে লজ্জা করে, একটি ধর্ষককে ভদ্রলোক বলেন বিকাশবাবু? নিজের দলের বুথ এজেন্ট আনন্দ সর্দারের কুকীর্তি ঢাকা আর উসকানিদাতা নেতা লাহেক আলিকে বাঁচাতে এরা আজ সেই পুরনো ছক মেনেই মিথ্যা ন্যারেটিভ খাড়া করতে চাইছে।

হিন্দু সমাজকে আজ এই ভয়ঙ্কর সত্যটা সচেতনভাবে উপলব্ধি করতে হবে। যারা ক্ষমতায় থাকলে বানতলা-ধানতলার খুনি-ধর্ষকদের আড়াল করতে কুৎসিত মন্তব্য ছড়ায়, আর ক্ষমতা হারালে নিজেদের মদতপুষ্ট অপরাধীদের বাঁচাতে গোটা রাজ্যকে অশান্ত করতে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ে না— তারা পশ্চিমবঙ্গের শান্তি, সনাতন সংস্কৃতি এবং আমাদের মা-বোনদের সুরক্ষার সবচেয়ে বড়ো শত্রু। বারুইপুরের এই ঘটনা আমাদের মোহভঙ্গের জন্য যথেষ্ট। আর কতদিন এই ছদ্ম- প্রগতিশীলদের প্রোপাগান্ডার শিকার হবে বাঙ্গালি? প্রচারের বিষাক্ত মায়াজাল ছিঁড়ে ফেলুন, সত্যের স্বচ্ছ আয়নায় আসল অপরাধীর চেহারাটা চিনে রাখুন এবং পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে এই ভণ্ড, ছদ্ম-ভদ্রলোকদের চিরতরে বয়কট এবং উপড়ে ফেলার সংকল্প নিন। □

(৯০)

রাজগিরির উষ্ণধারায়

স্বাস্থ্যোদ্ধারে রাজগিরির উষ্ণপ্রস্রবণের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এই বিষয়ে ডাক্তারজীকে অনেকে অনুরোধ করলেও 'পরে দেখা যাবে' বলে এড়িয়ে যেতেন। সেবার তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'মহারাষ্ট্র' পত্রিকার সম্পাদক গোপালরাও ওগলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন এবং ড: রাজেন্দ্র প্রসাদের পরামর্শে তিনমাস রাজগীরের উষ্ণ প্রস্রবণে দু-বেলা স্নান করেন। সেখানকার জল পান করে অনেকটা সুস্থতা লাভ করে ফিরে আসেন এবং ডাক্তারজীকে অনুরোধ করেন রাজগিরি যাওয়ার জন্য। তখন ডাক্তারজী সম্মত হলেন।

৩১ জানুয়ারি ১৯৪০, ডাক্তারজী নাগপুর থেকে রাজগিরির উদ্দেশে রওনা হলেন। সঙ্গে ছিলেন আপ্পাজী জোশী, তাত্যা তেলঙ্গ এবং বাবাজী কল্যাণী। রাজগিরিতে রামলাল জৈনের বাড়ি ডাক্তারজীর থাকার জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ভোর সাড়ে চারটায় উঠে আপ্পাজীর সঙ্গে টমটমে ডাক্তারজী উষ্ণ প্রস্রবণে স্নানের জন্য যেতেন। প্রায় এক মাইল দূর— টমটমে করে এই পথ যেতেও ডাক্তারজীর অনেক সময় কষ্ট হতো। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ এই ধারার নীচে বসে থাকলে ডাক্তারজীর ব্যথা অনেক উপশম হতো, শরীরটা ঝরঝরে লাগতো। অনেকে স্নানের জন্য আসতেন তাই ডাক্তারজী অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়তেন। কিন্তু হিন্দু সমাজের এত বড়ো একজন সংগঠক দেশমাতৃকার চরণে সমর্পিত জীবনের এক আলোকবর্তিকা, তাঁর প্রভাব কোথাও পড়বে না, তা কি হয়। ধীরে ধীরে ডাক্তারজীর কথা জানার পরে অন্য স্নানার্থীরা ডাক্তারজীকে আগে

গল্পকথায় ডাক্তারজী

জায়গা করে দিতেন। বিহারের একজন জমিদার চৌকিদার প্রহরায় নিত্য স্নান করতেন কিন্তু ডাক্তারজী আসার খবর পেলেই এক পাশে সরে দাঁড়াতেন— আগে তাঁকে স্নানের অনুরোধ করতেন।

সকলে এমন প্রভাবিত হয়েছিলেন যে অনেক সজ্জন ডাক্তারজীকে তাঁদের বাড়িতে আসার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ জানান। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও ডাক্তারজীর লক্ষ্য ছিল সঙ্ঘকার্যের প্রসার। এক দিনের ঘটনা। সেদিন ডাক্তারজী উষ্ণকুণ্ড থেকে স্নান করে ফেরার পরে ক্লান্তিবশত বালিশে ঠেস দিয়ে একটু শুয়ে ছিলেন। পাঁচ সাত মিনিট পরে তন্দ্রা কেটে গেল। তিনি উঠে সেখানে উপস্থিত তাত্যা তেলঙ্গকে জিজ্ঞেস করলেন কেউ এসেছিল কিনা। 'মালিক ঘুমোচ্ছেন' বলে তিনি তাদের পরে আসতে বলেছেন। একথা শুনে ডাক্তারজী যেন একটু বিরক্ত হলেন। তিনি বললেন, 'আমরা এক অপরিচিত স্থানে এসেছি। এখানে কোনো কারণে যে ছাত্ররা এসেছিল, তাদের সঙ্গে পরিচয় করার বদলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। যাও, ওরা কাছাকাছি আছে নিশ্চয়ই। ডেকে নিয়ে এস'। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে হাজির হলো। ডাক্তারজী তাদের ঘরে বসিয়ে নানা গল্প জুড়ে দিলেন। কোন ক্লাসে পড়ো, প্রিয় শিক্ষক কে, বিকালে তারা কী খেলাধুলা করে ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাদের কাছ থেকে কথাচ্ছলে জানলেন। যাবার সময় তাদের হাতে এক টাকা দিয়ে দিলেন। সাধারণ মনে হলেও সেই দিনকার এই পরিচয় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এদের মাধ্যমেই পরে সেখানে শাখা শুরু হলো।

বিশেষ অনুষ্ঠানে সাত আট দিনের জন্য ডাক্তারজী নাগপুরে গেলে ১৮ মার্চ আবার নাগপুর থেকে ফিরে উষ্ণ প্রস্রবণ চিকিৎসা শুরু করেন। শরীরকে চিকিৎসার জন্য সঁপে দিলেও মন জুড়ে সঙ্ঘকার্য বৃদ্ধির চিন্তা, সঙ্ঘকার্য কতটা বৃদ্ধি হলে কাজে সফলতা আসবে। এ বিষয়ে তিনি কয়েকজন স্বয়ংসেবককে পত্র লেখেন— 'আমাদের সঙ্ঘকে প্রভাবী করে তোলার জন্য আপনাদের একটি কথাই জানাতে চাই যে তিন বছরের মধ্যে (১৯৪০-১৯৪২) নিজেদের প্রান্তে গণবেশধারী তরুণ স্বয়ংসেবকের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে গ্রামাঞ্চলে এক শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে তিন শতাংশ করে ফেলতে হবে। এ বিষয়ে পূর্ণ চিন্তা করে যদি আপনারা সকলে উৎসাহ তথা নিষ্ঠা সহকারে কাজে সংলগ্ন থাকেন, তাহলে আমার বিশ্বাস তিন বছরের মধ্যে এই কাজ হই হই করে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। পরমেশ্বরের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে তিনি আপনাদের অঙ্গীকারকৃত কার্যে সফলতা প্রদান করুন।

সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস